ভারতে (বড় থেকে ছোট) পাঁচ ধরণের আবহাওয়া কেন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে প্রথম তিন ধরণের কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত আবহাওয়াবিদ এবং উন্নতমানের যন্ত্রাদির সাহায্যে আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সঙ্কেতবন্ধ করার সুযোগ রয়েছে। বাকী দু-ধরণের কেন্দ্রগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। সেখান থেকে শুধুমাত্র বায়ুর তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রধান কেন্দ্রে পাঠান হয়। প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে এবং মূল কেন্দ্র পুনায় সমস্ত আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে প্রেরিত তথ্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন জাহাজ, বিমান ও উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক দিন সারা দেশের আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়।

আবহাওয়া মানচিত্র (Weather Map) বলতে এক্ষেত্রে এমন এক মানচিত্রকে বোঝায় যা কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের সামগ্রিক অবস্থাকে নির্দেশ করতে প্রস্তুত করা হয়। বহুবিধ সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে এই মানচিত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুমণ্ডলের বৈচিত্র্যময় অবস্থাকে তুলে ধরা হয়। ভারতীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ (Indian Meteorological Department) আমাদের দেশের দৈনন্দিন আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়োজনে প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে আটটা ও বিকেল সাড়ে পাঁচটা এই দু'সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবহাওয়ার অবস্থাকে দু'টি আওহাওয়া মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। ঐ মানচিত্রকে ইণ্ডিয়ান ডেইলি ওয়েদার রিপোর্ট (Indian Daily Weather Report) বলা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রস্তুত এই ধরণের দৈনন্দিন আবহাওয়া মানচিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে উদ্ভুত আবহাওয়ার প্রকৃতি এবং সময়ের সাথে তার পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ক্রমশই সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। এইরূপ ধারণা বা জ্ঞান ব্যতীত কোন স্থান বা অঞ্চলের আগামী এক-দু দিনের আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কীত সঠিক পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই কারণে আবহ বিজ্ঞানে আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুত এবং তার যথাযথ পাঠ বা ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- আবহাওয়া মানচিত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- আবহাওয়া মানচিত্র পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবহাওয়া মানচিত্রে কোন বায়বীয় উপাদানগুলির উল্লেখ প্রাধান্য পায় এবং কেন পায় বোঝাতে পারবেন।
- কিভাবে আবহাওয়া মানচিত্র পাঠ শুরু করতে হয় তার ধারণা দিতে পারবেন।
- সমচাপ রেখার বিন্যাস এবং বায়ুর চাপের তারতম্য কিভাবে কোন স্থানের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবহাওয়া মানচিত্র পাঠের মাধ্যমে কিভাবে কোন স্থানের আবহাওয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

8.2 আবহাওয়া মানচিত্র এবং তার পকারভেদ

আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য আবহবিদগণ বিভিন্ন ধরণের মানচিত্র প্রস্তুত করে থাকেন, যেমন—

(ক) স্টেশন মডেল ভিত্তিক আবহাওয়া মানচিত্র (Station Model based Weather Maps)।

(খ) স্টেশন মডেল ভিত্তিক নয় এমন আবহাওয়া মানচিত্র (Non-Station Model based Weather Maps)।

(গ) উর্ধ্বস্তরের বায়ুপ্রবাহের ধরণ নির্দেশক মানচিত্র (Upper-air Circulation Maps)।

(ঘ) উপগ্রহ প্রেরিত চিত্র ভিত্তিক আবহাওয়া মানচিত্র (Satellite photo based Weather Maps)।

প্রধান আবহকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত আবহবিদগণ বিভিন্ন ধরণের তথ্যের ভিত্তিতে সারাদিন ধরে বহুধরণের আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে থাকেন। অনেক সময় কমপিউটারের সাহায্য নেওয়া হয় যাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়ার কাজ সহজতর হয়।

এই এককের মাধ্যমে আপনারা যে আবহাওয়া মানচিত্র ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন তা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত স্টেশন 'মডেল ভিত্তিক নয় এমন আবহাওয়া মানচিত্র'। এই ধরণের আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুতে সংক্ষেপে বায়ুর কতকগুলি উপাদানের অবস্থা, মোটের ওপর আবহাওয়ার অবস্থা এবং সমুদ্রের অবস্থা নির্দেশক কিছু সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। 'স্টেশন মডেল ভিত্তিক আবহাওয়া মানচিত্রের' তুলনায় এই মানচিত্র অপেক্ষাকৃত সরল। ভারতীয় দৈনিক আবহাওয়া মানচিত্র (Indian Daily Weather Report) এই শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ায় এই এককে বিভিন্ন ঋতুর বা সময়ের কয়েকটি আই.ডি.ডবলিউ.আর (IDWR) নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই এককের পরবর্তী অংশ 'স্টেশন মডেল প্রস্তুত ও ব্যাখ্যা' শীর্ষক পর্ব পাঠের মাধ্যমে আপনারা ভারতীয় দৈনিক আহহাওয়া মানচিত্রে ব্যবহৃত সমস্ত ধরণের সঙ্কেত চিহ্নের অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হবেন। দৈনিক আবহাওয়া মানচিত্রের ওপরে তারিখ, বার এবং সময় নির্দেশ করা থাকে। ডানদিকের কোণে মানচিত্রে ব্যবহৃত সঙ্কেত চিহ্নসমূহ দেখান হয়। বিভিন্ন আবহাওয়া কেন্দ্রের অবস্থান বোঝাতে একেকটি ছোট বৃত্ত আঁকা থাকে এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে মেঘের পরিমাণ দেখান হয়। বৃত্তের বাইরে চিহ্নের মাধ্যমে বায়ুর দিক ও গতি, অধঃক্ষেপণের পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বায়ুর চাপের পরিমাণ বোঝাতে কতকগুলি সমচাপ রেখা অঙ্কিত থাকে। জলভাগের ওপর কিছু স্থানে (প্রয়োজন মত) সমুদ্রের অবস্থা নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

8.2.1 আবহাওয়া মানচিত্র ব্যাখ্যায় আলোচিত বিষয়সমূহ :

আবহাওয়া মানচিত্র ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণত আলোচনা করা হয় :

১। বায়ুর চাপ

ক) উচ্চচাপের অবস্থান

খ) নিম্নচাপের অবস্থান

গ) সমচাপরেখা বিন্যাসের ধরণ

ঘ) বায়ুর চাপের ঢাল

২। **বায়ুপ্রবাহ**

ক) বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ

খ) বায়ুপ্রবাহের গতি নির্দেশ

৩। **আকাশের অবস্থা**

ক) মেঘের পরিমাণ

খ) অন্যান্য বায়বীয় ঘটনা

৪। **অধঃক্ষেপন**

ক) সাধারণ বণ্টন

খ) ভারী বণ্টনের বিশেষ স্থান

৫। **সাধারণ বা গড় অবস্থা থেকে বায়ুর তাপের পরিবর্তন**

৬। **সমুদ্রের অবস্থা**

৭। **আবহাওয়ার পূর্বাভাস**

উপরোক্ত বিষয়গুলি বা আবহাওয়ার অবস্থা জ্ঞাপক দিক্‌গুলি সব মানচিত্রে কখনই একইরকম সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায় না। বর্ষা ঋতুর কোন দিনের আবহাওয়া মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানে মেঘাচ্ছন্নতা ও অধঃক্ষেপণ যতটা ব্যাপকভাবে দেখা যেতে পারে তা শীতকালের কোন নির্দিষ্ট দিকের মানচিত্রে দেখা যায় না। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের মানচিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

8.3 বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্র

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতবর্ষ মূলতঃ ক্রান্তীয় অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়ায় এবং গ্রীষ্ম ও শীতে এই দেশের ওপর দিয়ে দুই বিপরীতমুখী মৌসুমী (ঋতুগত) বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে ভারতের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির (Tropical Monsoon Type) জলবায়ু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বে গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই ভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম এবং শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের গতি-প্রকৃতি বোঝা সম্ভব হয়।

ক্রান্তীয় অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময় এখানকার আবহাওয়ায় তাপের পরিমাণ অধিক থাকে। মার্চ মাস থেকে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের আপাত গতির প্রভাবে ভারতের সর্বত্র তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। মে মাসে বায়ুর তাপের গড় পরিমাণ সর্বাধিক হয়। এই সময়ে স্থানবিশেষে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্ষণ হলেও মোটের ওপর আবহাওয়া উষ্ম ও শুষ্ক থাকে। এই কারণে মার্চ থেকে মে এই তিনমাস সময়কাল ভারতে উষ্ম গ্রীষ্ম ঋতু (Hot Summer Season) নামে অভিহিত। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসেও সর্বত্র

গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় কারণ সূর্যরশ্মি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধের ক্রান্তীয় অক্ষাংশে লম্ব বা প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়। কিন্তু এই সময়ে দেশের সর্বত্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের কারণে ব্যাপকভাবে বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে এপ্রিল-মে মাসের তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায় এবং বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ে।

অতএব বলা যায় আমাদের দেশে দীর্ঘ মেয়াদের গ্রীষ্ম ঋতুর দুটি পর্যায় আছে—(ক) উষ্ম ও শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতু (মার্চ থেকে মে মাস) এবং (খ) আর্দ্র গ্রীষ্ম ঋতু বা গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর ঋতু বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ঋতু (জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস)। এখানে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ চলাকালীন সময়ের আবহাওয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যেহেতু আমাদের দেশে শীত ঋতুর স্থায়িত্ব কাল কম (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত) সেইকারণে এই পর্বে ঐ সময়ের একটি মানচিত্র আলোচনা করা হয়েছে।

8.3.1 গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্র পাঠ :

মানচিত্র পরিচিতি : আলোচ্য আবহাওয়া মানচিত্রটি 1973 খ্রীস্টাব্দের 12ই জুলাই রবিবার, ভারতীয় প্রমান সময় 0830 ঘণ্টা বা সকাল সাড়ে আটটায় (G.M.T. সময় 0300 ঘণ্টা বা ভোর 3টে) তৈরী করা হয়।

এই মানচিত্রটিতে ভারতে বর্ষাকালের আবহাওয়ার একটি সুস্পষ্ট ছবি লক্ষ্য করা যায়। জুলাই মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। এ ছাড়া আবহাওয়ার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। **বায়ুর চাপ** :

(ক) **উচ্চ চাপের অবস্থান** : আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণভাগে সর্বাধিক বায়ুর চাপ (1012 মিলিবার) পরিলক্ষিত হয়। জুলাই মাসে সূর্যের অবস্থান এমন থাকে যে স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় অধিক উত্তপ্ত থাকে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত শীতল বিস্তীর্ণ সমুদ্রভাগের ওপর বায়ুর চাপ বেশী থাকে।

(খ) **নিম্নচাপের অবস্থান** : মানচিত্রে দেশের মধ্যভাগে একটি গভীর নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশান-এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া অন্যত্র কোথাও নিম্নচাপ নেই। মধ্যভারতের ডিপ্রেশানটিতে আবদ্ধ সমচাপ রেখার সংখ্যা 3টি এবং কেন্দ্রে বায়ুর চাপের পরিমাণ 996 মিলিবার।

(গ) **সমচাপ রেখা বিন্যাসের ধরণ** : মধ্যভারতের ডিপ্রেশানটিকে কেন্দ্র করে কতকগুলি সমচাপ রেখা বৃত্তাকার ও প্রায় বৃত্তাকারে বিন্যস্ত রয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে এবং আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের ওপর সমচাপরেখাগুলি মানচিত্রের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। ব্যতিক্রম হিসাবে 1010 মিলিবার সমচাপ রেখাটির বিন্যাসের ধরণ উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতের অবস্থানের প্রভাবে তাপ ও চাপের পরিবর্তন হেতু এই রেখাটি জলভাগ থেকে স্থলভাগে প্রবেশ করার পর সুস্পষ্টভাবে দক্ষিণদিকে বেঁকে প্রসারিত হয়েছে। স্থলভাগ অতিক্রম করার পর রেখাটি আবার সরলপথে বঙ্গোপসাগরের ওপর প্রসারিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় এই মানচিত্রে জলভাগ ও স্থলভাগে সমচাপ রেখার বিন্যাসের ধরণ একদমই আলাদা। স্থলভাগে (বিশেষত মধ্যভারতে) স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক চাপের পার্থক্য হেতু কয়েকটি বৃত্তকার বা প্রায় বৃত্তাকার সমচাপ রেখার অবস্থান তৈরী হয়েছে। কিন্তু জলভাগে সুসমভাবে চাপের পার্থক্য থাকায় সমচাপ রেখাগুলি প্রায় সোজা ও সমান্তরাল।

(ঘ) **বায়ুর চাপের ঢাল** : মানচিত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন চাপের মধ্যে (1012 mb–996 mb) ব্যবধানের পরিমাণ 16 মিলিবার। যে দূরত্বের মধ্যে বায়ুর চাপের এই পার্থক্য ঘটেছে তাতে বায়ুর চাপের ঢালের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলা যায়। তবে চিত্র 2-এ প্রস্থচ্ছেদ অনুযায়ী দেখা যায় স্থলভাগে তুলনামূলকভাবে কম পরিসর স্থানের মধ্যে বেশী সমচাপ রেখা থাকায় সেখানে বায়ুর চাপের ঢালের পরিমাণ অধিক।

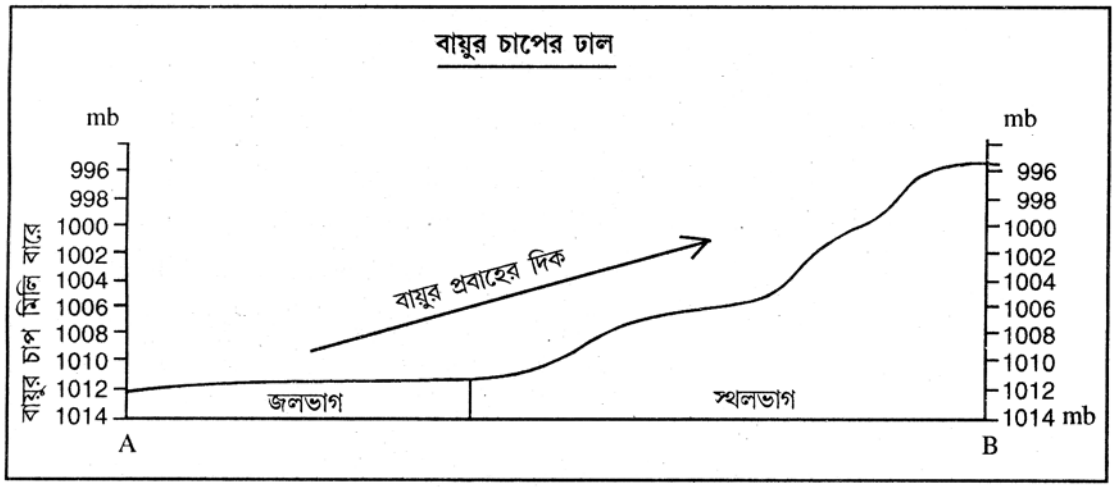

২। **বায়ুপ্রবাহ** :

(ক) **বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ** : মধ্য-ভারতের নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে চতুর্দিক থেকে বাতাস ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ক্রমে (Anti-Clockwise) প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে নিম্নচাপের পশ্চিম ও পূর্বভাগের বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক নির্দেশিত হয়েছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বায়ু প্রধানত পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে বায়ু প্রবাহের দিক হল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে এবং স্থানবিশেষে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

(খ) **বায়ুপ্রবাহের গতি নির্দেশ** : স্থলভাগে বায়ুপ্রবাহের গতি গড়ে ঘণ্টাপ্রতি 5 থেকে 15 নট। এরূপ গতিসম্পন্ন বাতাসকে মৃদুবায়ু প্রবাহ (Gentle breeze) বলা যায়। জলভাগের ওপর দু-তিন জায়গায় বায়ুর গতি 20 নট লক্ষ্য করা যায়।

৩। **মেঘের পরিমাণ** :

(ক) **মেঘের পরিমাণ** : মধ্য-পশ্চিম ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্য সমূহের অধিকাংশ স্থানে আকাশ পুরোপুরি মেঘাবৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী কিছু স্থানেও (মুম্বাই, রত্নগিরি, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি) আকাশ মেঘাবৃত। দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব উপকূল অঞ্চলে আকাশ কিছু স্থানে মেঘমুক্ত এবং কিছু স্থানে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। উত্তর ভারতেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মোটের ওপর দেশের অধিকাংশ স্থানে আকাশ অর্ধেক বা তার বেশী পরিমাণে মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমভাগেই মেঘের আবরণের পরিমাণ সর্বাধিক।

(খ) **অন্যান্য বায়বীয় ঘটনা** : খুবই বিচ্ছিন্ন ভাবে দু-একটি স্থানে অন্যান্য বায়বীয় ঘটনার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, যেমন—দিল্লীতে কুজঝটিকা (Haze) বা সুরাটে ঝিরঝিরে বৃষ্টি (Drizzle)।

৪। **অধঃক্ষেপন** :

(ক) **সাধারণ বণ্টন** : যদিও এটি বর্ষাকালের আবহাওয়ার মানচিত্র তথাপি যে নির্দিষ্ট সময়ের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেই সময়ে দু-একটি অঞ্চল বাদে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু স্থানে 1 থেকে 5 সেমি মত বৃষ্টি হয়েছে।

(খ) **ভারী বন্টনের বিশেষ স্থান** : মানচিত্রে দুটি অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হওয়ার নিদর্শন রয়েছে। (i) মধ্যভারতের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কয়েকটি স্থানে 3 সেমি থেকে সর্বাধিক 16 সেমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে। নিম্নচাপের অবস্থানই এই অঞ্চলে ভারী বর্ষণের মুখ্য কারণ। এছাড়া (ii) উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য রাজ্য সমূহের স্থানে স্থানে ভাল বৃষ্টি হয়েছে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জীতে অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বৃষ্টিপাত বেশী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সেখানে সারা দেশের মধ্যে সর্বাধিক 22 সেমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

৫। **স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বায়ুর তাপের পরিবর্তন**—এ সম্পর্কীত কোন তথ্য এই মানচিত্রে দেওয়া নেই।

৬। **সমুদ্রের অবস্থা** : আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের কিছু স্থানে সমুদ্রের অবস্থা খারাপ (very rough)। ঐ সব স্থানে উত্তাল ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে সমুদ্রের অবস্থা মধ্যম।

৭। **আবহাওয়ার পূর্বাভাস** : পর্যবেক্ষণের সময় ডিপ্রেশানটির অবস্থান লক্ষ্য করে বলা যায় যে, আগামী 24 ঘণ্টায় সেটি আরও কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে সরে যেতে পারে। কারণ এই ধরণের নিম্নচাপ বা ডিপ্রেসানগুলি বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভুত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে থাকে, যেহেতু এসব অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম থাকে। অতএব বলা যায় আগামী 24 ঘণ্টায় পূর্ব রাজস্থান, দিল্লী, পাঞ্জাব-হরিয়ানা, উত্তর মধ্যপ্রদেশে অংশ বিশেষে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে যেরকম মেঘাচ্ছন্ন আছে সেরকমই থাকার সম্ভাবনা বেশী। দেশের বাকি অংশে আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকবে।

উপসংহার :

এই মানচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে একটি গভীর নিম্নচাপ বা ডিপ্রেশান তৈরী হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিছু স্থানে ভারী বর্ষণ ঘটানোর অবস্থা উপস্থাপিত হওয়া। এ ছাড়া এই মানচিত্রে স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে বায়ুর চাপের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মানচিত্রটিতে বর্ষাকালীন আবহাওয়ার পরিষ্কার চিত্র লক্ষ্য করা যায়—সর্বত্র বৃষ্টিপাত না হলেও দেশের অধিকাংশ স্থানে আকাশ পুরোপুরি বা আংশিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকা।

৯.১.2 শীত ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্র পাঠ :

মানচিত্র পরিচিতি : আলোচ্য আবহাওয়া মানচিত্রটি 1985 খ্রীষ্টাব্দের 15ই জানুয়ারী মঙ্গলবার, ভারতীয় প্রমাণ সময় 0830 ঘণ্টা বা সকাল সাড়ে আটটায় (G.M.T. সময় 0300 ঘণ্টা বা ভোর 3টে) প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই মানচিত্রটিতে ভারতে শীত ঋতুর একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের আবহাওয়ার প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ অধিকতর শীতল থাকে। এই ঋতুতে বায়ু স্থলভাগের উচ্চচাপ থেকে সমুদ্রভাগের ওপর বিরাজমান নিম্নচাপ অভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই বাতাস উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহ নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এই বাতাস সমুদ্রের ওপর পৌঁছয় এবং সেখান থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে (বিশেষতঃ পূর্ব-উপকূলে) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই কারণে ভারতে শীতকালকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ঋতুও বলা হয়। নিম্নে মানচিত্রটির আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হল।

১। **বায়ুর চাপ** :

(ক) **উচ্চ চাপের অবস্থান** : এই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একটি সুস্পষ্ট উচ্চ চাপ কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তানের ওপর অবস্থান করছে। এই উচ্চ চাপ কেন্দ্রে বায়ুর চাপের পরিমাণ 1020 মিলিবার। এছাড়া উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিম নেপালের পার্বত্য ভূমিভাগের ওপর এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কাছে চীনের কিয়দংশে বায়ুর চাপ বেশী (1020 মিলিবার) রয়েছে।

(খ) **নিম্নচাপের অবস্থান** : মানচিত্রের দক্ষিণভাগে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের ওপর বায়ুর চাপ সর্বাপেক্ষা কম (1012 মিলিবার)। যদিও ঐ অঞ্চলে কোন সুস্পষ্ট নিম্নচাপের অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না।

(গ) **সমচাপ রেখার বিন্যাসের ধরণ** : মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত উচ্চচাপ কেন্দ্রকে ঘিরে 1018 মিলিবার সমচাপ রেখাটি কিছুটা প্রায় বৃত্তাকার রূপ নিলেও দেশের অন্যত্র এবং সমুদ্রভাগের ওপর স্থিত অন্যান্য সমচাপ রেখাগুলি প্রায় সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে 1014 মিলিবার সমচাপ রেখাটির জলভাগ এবং স্থলভাগের ওপর বিন্যাসের ধরণ উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ পশ্চিম ঘাট পর্বতের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই সমচাপ রেখাটি স্থলভাগে প্রবেশের পর স্থানীয়ভাবে দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে।

(ঘ) **বায়ুর চাপের ঢাল** : এই মানচিত্রে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন বায়ুর চাপের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ 8 উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর এই চাপের পার্থক্য ঘটেছে তাতে দূরত্বের বিচারে বায়ুর চাপের ঢাল যথেষ্ট মৃদু প্রকৃতির বলা যায়।

২। **বায়ুপ্রবাহ** :

(ক) **বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ** : দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থানে বাতাস পূর্ব ও কিছুটা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমগামী হলেও, উত্তর ভারতে বায়ুপ্রবাহের কোন নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করা যাচ্ছে না। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থানবিশেষে বাতাস উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু উত্তর-পূর্ব ও উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

(খ) **বায়ুপ্রবাহের গতি নির্দেশ** : আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি স্থানে বায়ুর গতি ঘণ্টায় 10-20 নট লক্ষ্য করা যায়। স্থলভাগের ওপর বায়ুর গতি খুবই কম, 0-5 নটের মত।

৩। আকাশের অবস্থা :

(ক) মেঘের পরিমাণ : উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে আকাশে মেঘের 5-8 অক্টা। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 4-6 অক্টা। পূর্ব ভারতে ও উত্তর-মধ্য ভারতে কোথাও আকাশ পরিষ্কার, কোথাও আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। দক্ষিণ ভারতেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

(খ) অন্যান্য বায়বীয় ঘটনা : উত্তর ভারতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুজ্ঝটিকা (Haze), কুহেলী (Mist) এবং কুয়াশার (Fog) চিহ্ন রয়েছে। উত্তর-পূর্বে মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশের স্থানে-স্থানে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষে; পশ্চিমে মুম্বাই, পুনে; দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ, মাদুরাই প্রভৃতি স্থানেও কুজ্ঝটিকার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। মানচিত্রে মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টকের নিকটবর্তী পেন্ড্রা (Pendra) কেন্দ্রের ওপর বজ্রঝড়ের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বায়বীয় ঘটনার সঙ্কেত নেই।

৪। অধঃক্ষেপন :

যেহেতু এই মানচিত্রের কোথাও অধঃক্ষেপণের কোন পরিমাণ নির্দেশিত হয় নি, অতএব বলা যায় স্থান বিশেষে আকাশ আংশিক বা পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বৃষ্টিপাত হয় নি।

৫। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বায়ুর তাপের পরিবর্তন :

সর্বোচ্চ তাপের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে তাপ 2-4° সেঃ বেড়েছে এবং মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে তাপ অধিকাংশ স্থানে 1-2° সেঃ হ্রাস পেয়েছে।

সর্বনিম্ন তাপের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বত্রই তাপ বেড়েছে। স্থানবিশেষে এই বৃদ্ধির পরিমাণ 0-4° সেঃ।

৬। সমুদ্রের অবস্থা :

যেহেতু মানচিত্রে সমুদ্রের অবস্থা নির্দেশক চিহ্নের কোন ব্যহবার নেই, অতএব বলা যায় সমুদ্রের অবস্থা শান্তই রয়েছে।

৭। আবহাওয়ার পূর্বাভাস :

পর্যবেক্ষণকালীন আবহাওয়ার অবস্থা থেকে অনুমান করা যায় যে আগামী 24 ঘণ্টায় দেশের আবহাওয়া প্রায় একই রকম থাকবে। কারণ বায়ুর চাপের ঢল কম আছে, কোন নির্দিষ্ট গভীর উচ্চতাপ ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয় নি। অতএব বলা যায় পূর্ব পাঞ্জাব-হরিয়ানা, উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের স্থান বিশেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে, বাকি সর্বত্র আংশিক মেঘলা থাকবে। উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকা বা কুহেলী লক্ষ্য করা যেতে পারে।

উপসংহার .

শীত ঋতুর এই আবহাওয়া মানচিত্রটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল আবহাওয়া বিশেষ পরিচ্ছন্ন না হলেও কো স্থানেই বায়ুপ্রবাহ জোড়াল নয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে কুয়াশা, কুহেলী ও কুজ্ঝটিকা ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব

আবহাওয়ার পূর্বাভাস (Weather Forecasting)

আবহ বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন স্থান বা অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দান। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলতে এক্ষেত্রে কোন স্থান বা অঞ্চলের আবহাওয়ার আগামী সময়ে (দিন বা মাসের বিচারে) উদ্ভূত অবস্থার সঠিক উল্লেখকে বোঝায়। এই পূর্বাভাস দু'ধরণের হতে পারে—(ক) স্বল্প সময়ের জন্য (Short range forecasting) (আগামী 1 থেকে 3 দিনের) এবং/অথবা (খ) দীর্ঘ সময়ের জন্য (Long range forecasting) (আগামী 3 থেকে 6 মাসের/ঋতুভিত্তিক)। সাধারণভাবে স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাস অধিক প্রচলিত হলেও কৃষিকার্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভবিষ্যৎ সুবিধা-অসুবিধা বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মানচিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে আবহাওয়ার যথাযথ পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভবপর নয়। সঠিক পূর্বাভাস দিতে হলে একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র টানা কয়েক দিন পাঠ করা দরকার হয়। এছাড়া পূর্বাভাস নিখুঁত করার জন্য কোন স্থান বা অঞ্চলের বছরের বিভিন্ন সময়ের জলবায়ুর ঋতুগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই।

এই পাঠে বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত 12 জুলাই তারিখের মানচিত্রে নিম্নচাপের কেন্দ্রটি তার বর্তমান অবস্থান থেকে আগামী 24 ঘণ্টায় কোন দিকে কিভাবে এগোতে পারে তার পূর্বাভাস দিতে হলে ঐ নিম্নচাপটির বিগত 48 ঘণ্টার অবস্থান লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এ বাদে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরের তাপ, চাপ ও বায়ুপ্রবাহ বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন থেকে যায়।

8.4 সারাংশ

যদিও আবহাওয়া বলতে কোন স্থান বা অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত স্বল্পকালীন অবস্থাকে বোঝায়, তথাপি কোন অঞ্চল বা দেশের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া নির্দেশক মানচিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে ঐ অঞ্চল বা দেশের আবহাওয়ায় বৈচিত্র্য ও রূপান্তর সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি। আবহাওয়া মানচিত্র যথাযথ পাঠের জন্য এই মানচিত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন সমূহ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্র কোন দেশের বিভিন্ন সময়ের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের জানতে সাহায্য করে।

8.5 প্রশ্নাবলী

1) আবহাওয়া মানচিত্র বলতে কি বোঝেন?

2) আবহাওয়া মানচিত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

3) আবহাওয়া মানচিত্রে প্রধানতঃ কোন বায়বীয় উপাদানগুলির সঙ্কেতবদ্ধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়?

4) প্রদত্ত বর্ষা ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্রটির বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের ধরণ ব্যাখ্যা করুন।

5) প্রদত্ত শীত ঋতুর আবহাওয়া মানচিত্রটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করুন।

6) বায়ুর চাপের ঢাল বলতে কি বোঝান হয়? প্রদত্ত মানচিত্রগুলির বায়ুর চাপের ঢাল নির্দেশ করুন।

8.6 উত্তর সঙ্কেত

প্রশ্নক্রম :

1) উত্তরের জন্য 8.1 অংশ দেখুন।

2) উত্তরের জন্য 8.1 অংশ দেখুন।

3) উত্তরের জন্য 8.2.1 অংশ দেখুন।

4) উত্তরের জন্য 8.3.1 অংশ দেখুন।

5) উত্তরের জন্য 8.3.2 অংশ দেখুন।

6) উত্তরের জন্য 8.3.1 অংশ দেখুন।

একক 9 □ ভূরূপমিতি (Morphometry)

গঠন

9.0 প্রস্তাবনা

9.1 উদ্দেশ্য

9.2 ভূরূপমিতি ঃ সংজ্ঞা, পদ্ধতি

9.3 পরিলেখ

- 9.3.1 পরিলেখ অঙ্কন পদ্ধতি
- 9.3.2 সারিবদ্ধ পরিলেখ
- 9.3.3 অধ্যারোপিত পরিলেখ
- 9.3.4 বিমিশ্র পরিলেখ
- 9.3.5 অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ

9.4 আপেক্ষিক ভূমিরূপ

- 9.4.1 আপেক্ষিক ভূমিরূপ নির্ণয় পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা

9.5 ব্যবচ্ছেদনের সূচক

- 9.5.1 ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয় পদ্ধতি
- 9.5.2 ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

9.6 নদীর ক্রমবিন্যাস

- 9.6.1 হর্টনের নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি
- 9.6.2 স্ট্রলারের নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি
- 9.6.3 শ্রীভের নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি
- 9.6.4 সেইডেগারকৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি
- 9.6.5 নদীর ক্রমবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা
- 9.6.6 দ্বিধাবিভক্তির হার

9.7 জলনির্গম আভীক্ষ্য

- 9.7.1 জলনির্গম আভীক্ষ্য নির্ণয়ের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা

9.8 জলনির্গম বা নদী ঘনত্ব

- 9.8.1 জলনির্গম ঘনত্ব বা নদী ঘনত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি
- 9.8.2 নদী ঘনত্বের প্রয়োজনীয়তা

9.9 প্রশ্নমালা

9.10 গ্রন্থপঞ্জী

9.0 প্রস্তাবনা

ভূমিরূপ সংক্রান্ত গবেষণায় ও আলোচনায় ভূরূপমিতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই ভূগোলের ছাত্রছাত্রী হিসেবে আপনাদের ভূরূপমিতি কাকে বলে, তার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা দরকার। স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রে প্রদত্ত তথ্যাবলীর বিস্তৃত পর্যালোচনা ভূরূপমিতির সাহায্যে সম্ভব।

9.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- পরিলেখ অঙ্কন করতে ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সারিবদ্ধ পরিলেখ, অধ্যারোপিত পরিলেখ, বিমিশ্র পরিলেখ ও অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ অঙ্কন করতে ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করতে পারবেন।
- আপেক্ষিক ভূমিরূপ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ব্যবচ্ছেদনের হার নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নদী আভীক্ষ্য নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নদী ঘনত্ব নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারেবন।

9.2 ভূরূপমিতি (Morphometry)

ভূরূপমিতি বা Morphometry হল ভূমিরূপ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের চিত্রভিত্তিক রূপান্তর। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন রূপের আকৃতি ও প্রকৃতিগত গাণিতিক পরিমাপ ও বিশ্লেষণই ভূরূপমিতির বিষয়বস্তু। আয়তন, উচ্চতা, ভূমিঢাল, পরিলেখ এবং নদী ও অববাহিকা অঞ্চলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রধানত এখানে আলোচনা করা হয়। বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমন লেখচিত্র, মানচিত্র, বিভিন্ন পরিসংখ্যান সূচক ইত্যাদি। G. H. Dury (1952) classes the main groups of techniques as : (i) geometric anslysis, (ii) arithmetric analysis, (iii) volumetric analysis and (iv) clinometric analysis.

বর্তমান শতাব্দীতে ভূপরিমিতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক পর্যায়ে ভূপরিমিতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল উল্লেখযোগ্য ও বৃহৎ (Large scale) ভূমিরূপের বিশ্লেষণে যেমন, ঢাল, উপত্যকা, ক্ষয়িত ভূমিরূপ ইত্যাদি। এর পরবর্তী পর্যায়ে এল বড় স্কেলের স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের (Large Scale Topographical Maps) সাহায্যে ভূমিরূপের বিশদ পর্যালোচনা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নদী অববাহিকার বিশ্লেষণই ভূরূপমিতির প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এবং এই পদ্ধতিতে নদী অববাহিকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা আরাম্ভ হয়। এই ধরনের সূক্ষ্ম ভূরূপমিতি আলোচনায় (Micro Morphometry) ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের অধিক মাত্রার ব্যবহার প্রয়োজন।

1. Monkhouse, F. J. Maps and Diagrams ; (1989), p. 116.

ভূমিরূপ পর্যালোচনায় ভূরূপমিতির সাফল্য নিয়ে ভূবিদরা ভিন্ন ভিন্ন মত পেষণ করেন। কারুর কারুর মতে ভূমিরূপ পর্যালোচনায় ক্ষেত্র সমীক্ষার কোন বিকল্প নেই। এমনকি Dury যিনি ভূরূপমিতির একজন প্রবর্তক ও সমর্থক তিনিও এই মত পেষণ করেন (Dury, 1952)। এছাড়াও অনেক ভূসমীক্ষক যারা ভূরূপমিতির প্রবর্তক ও সমর্থক তাঁরাও বলেছেন যে ভূরূপমিতির যথার্থ সাফল্য সম্ভব বিস্তৃত ক্ষেত্র সমীক্ষার সহায়তায় (Banner and Strahler, 1956)। তবে স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র বা Topographical Map-এ প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণে ভূরূপমিতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সার্থকতা অবশ্যই নির্ভর করে মানচিত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির যাথার্থতার উপর।

ভূরূপমিতির যে বিষয়গুলি এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলি হল ঃ

(1) পরিলেখ (Profiles)

(2) আপেক্ষিক ভূমিরূপ (Relative Relief)

(3) ব্যবচ্ছেদণের সূচক (Dissection Index)

(4) নদী আভীক্ষ্ণ্য বা জলনির্গম আভীক্ষ্ণ্য (Drainage Frequency বা Stream Frequency)

(5) নদী ঘনত্ব (Drainage Density)।

9.3 পরিলেখ (Profiles)

কোন অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field Work) বা জরিপকার্যের (Survey) কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ভূমিরূপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য সমোন্নতি রেখাসূচক মানচিত্র (Contoured Map) বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকারের জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ভূসংস্থানিক মানচিত্রে (Topographical sheet) সমোন্নতি রেখার অবস্থান সম্পর্কিত বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এইরূপ নিজস্ব সংস্থা আছে যারা ভূসংস্থানিক মানচিত্র প্রকাশ করে। সমোন্নতি রেখাসূচক মানচিত্র আমাদের কোন অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে নানা তথ্য ও প্রাথমিক ধারণা দেয় বটে কিন্তু এই ধারণা সবসময় সম্পূর্ণ নয়। পরিলেখ (Profile) একটি মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা কোন অঞ্চলের ভূমির ঢাল, উপত্যকা অধিত্যকার অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারি এবং ভূমিরূপটি মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিলেখ হচ্ছে সমোন্নতি রেখাসূচক মানচিত্রে পরিবেশিত তথ্যের একটি বিশেষ রূপান্তর যার সাহায্যে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়। ভূমিরূপ বিজ্ঞানের (Geomorphology) ক্ষেত্রে পরিলেখের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এফ্. জে. মঙ্কহাউস ও এইচ্. আর. উইলকিন্সন্ (F. J. Monkhouse and H. R. Wilkinson) তাদের বিখ্যাত পুস্তক 'ম্যাপস্ এন্ড ডায়াগ্রামস্ (Maps and Diagrams)-এ বলেছেন—"The drawing of a profile from a contour map may be of very great assistance in visualizing the relief, and in the description and explanation of the landforms."[1]

পরিলেখ (Profile) ও প্রস্থচ্ছেদ (Cross Section) এই শব্দ দুটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহুসময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে যা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। ছেদ (Section) কথাটির অর্থ হল কর্তিত। অর্থাৎ যেখানে কর্তনের ফলে প্রকাশিত ভূমির বিস্তৃত বিবরণ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ছেদ কথাটি ব্যবহার করি। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র (Geological

[1] pp. 118, Maps and Diagrams, F. J. Monkhouse and H. R. Wilkinson, 1971.

Map) থেকে অঙ্কিত প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological Structure) দেখানো হয় সেখানে প্রস্থচ্ছেদ কথাটির ব্যবহার সঠিক। আর পরিলেখ (Profile) কথাটি ব্যবহার করা হয় সেখানে যেখানে একটি কল্পিত সমতল (Plane of a section) প্রকৃত ভূমিভাগকে ছেদন করে। পরিলেখ দৈর্ঘ্য বরাবর (Longitudinal) বা প্রস্থ বরাবর (Transverse) হতে পারে। তবে দৈর্ঘ্য বরাবর বা প্রস্থ বরাবর পরিলেখ সাধারণত নদীর ক্ষেত্রে করা হয় যার সাহায্যে নদীর পর্যায় ও ক্ষয়চক্র (cycle of erosion) সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

9.3.1 পরিলেখের অঙ্কণ পদ্ধতি ঃ

পরিলেখ অঙ্কণ করতে হলে সর্বপ্রথম মানচিত্রের যে অংশের পরিলেখ অঙ্কণ করার ইচ্ছা সেখানে একটি সরলরেখা অঙ্কণ করতে হবে। তারপর সেই সরলরেখার উপর একটি সাদা কাগজ বসিয়ে সমোন্নতি রেখা, স্থানিক উচ্চতা (Spot heights) ও নদী সরলরেখাটিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেগুলি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে নিতে হবে। এইবার একটি গ্রাফ পেপারে বা সাদা কাগজে উক্ত রেখাটির সমান দৈর্ঘ্যের একটি ভিত্তিরেখা (Baseline) টানতে হবে। কাগজে অঙ্কিত ছেদবিন্দুগুলিকে এই ভিত্তিরেখা বা Baseline বা ভিত্তিরেখা উভয়প্রান্তে দুটি উলম্ব রেখা অঙ্কণ করে তাতে উলম্ব স্কেল (Vertical scale)-টি দেখাতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উলম্ব স্কেলটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সাধারণত যে অঞ্চলের পরিলেখ অঙ্কণ করা হচ্ছে সেই অঞ্চলের ভূমির বন্ধুরতা ও উচ্চতার তারতম্যই উলম্ব স্কেল নির্বাচনের মাপকাঠি। এটা মনে রাখতে হবে যে উলম্ব স্কেল সবসময়ই অনুভূমিক স্কেল (Horizontal scale) অপেক্ষা বড় হবে তা না হলে পরিলেখ থেকে ভূমি ঢালের তারতম্য সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। আবার উলম্ব স্কেল যদি অনুভূমিক স্কেল অপেক্ষা অধিক বড় হয় তবে ভূমি ঢালের তারতম্য হাস্যস্কররূপে প্রকট হয়ে পড়বে। তাই পরিলেখ অঙ্কণের ক্ষেত্রে উলম্ব স্কেল নির্বাচনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে উলম্ব স্কেল নির্বাচনের কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই—তাই ব্যক্তিবিশেষে স্কেলের তারতম্য ঘটতেই পারে। উলম্ব স্কেল ও অনুভূমিক স্কেলের সে সম্পর্ক তাকে বলা হয় উলম্ব বৃদ্ধি বা Vertical exaggeration। মনে করা যাক কোন একটি সমোন্নতি রেখা সূচক মানচিত্রের অনুভূমিকা স্কেল 2 সেমি = 1 কিমি, অর্থাৎ, RF হল 1 : 50,000। সেই মানচিত্র থেকে পরিলেখ অঙ্কণের সময় উলম্ব স্কেল নেওয়া হল 1 সেমি = 100 মিটার, অর্থাৎ, RF হল 1 : 10,000। এক্ষেত্রে Vertical Exaggeration হল 5 গুণ $\left(\frac{\text{অনুভূমিক স্কেল}}{\text{উলম্ব স্কেল}}\right)$। অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, উলম্ব স্কেলের বিরতি (intervals)-গুলি পূর্ণ মানে (অর্থাৎ, 10, 20, 30.....বা 20, 40, 60.....বা 100, 200, 300.....ইত্যাদি) হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে পরিলেখটি অঙ্কণ করতে সুবিধা হয়।

এবার ভিত্তিরেখা বা Baseline-এর চিহ্নিত বিন্দুগুলি থেকে তাদের উচ্চতা অনুসারে উলম্ব স্কেলের সাহায্যে লম্বরেখা টানতে হবে (রেখা না টেনে শুধুমাত্র উচ্চতা সূচক বিন্দুটি লম্বভাবে বসালেও চলবে)। এবার রেখার মাথাগুলি বা চিহ্নিত বিন্দুগলিকে একটি সুষমরেখার (Smooth line) দ্বারা যুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে কোনক্রমেই স্কেলের সাহায্যে যোগ করা চলবে না। যখন পরিলেখাটি অঙ্কণ করা হচ্ছে তখন নিম্নলিখত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা দরকার—

(1) দুটি প্রান্তে সঠিক উচ্চতা থেকে শুরু করা।

(2) দুটি একই মানের সমোন্নতি রেখা পরপর থাকলে তাদের অন্তর্বর্তী স্থানের উচ্চতা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।

(3) শিখর দেশগুলি সমতল না শঙ্কু আকৃতির তা সবিশেষ যত্ন সহকারে অঙ্কণ করা।

পরিলেখটি অঙ্কণ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট রেখাটির দিক (Orientation), গ্রিড মান (Grid value) এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা (Latitude ও Longitude) উল্লেখ করতে হবে। পরিলেখটির তলায় সুস্পষ্টভাবে উলম্ব ও অনুভূমিক স্কেল ও উলম্ব বৃদ্ধি (Vertical Exaggeration) উল্লেখ করতে হবে। এইভাবে অঙ্কিত একটি পরিলেখ আমাদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে সক্ষম।

উদাহরণ ঃ

1 নং চিত্রে একটি সমোন্নতি রেখাযুক্ত মানচিত্র আঁকা হয়েছে। এখানে সমোন্নতি রেখার ব্যবধান 100 ফুট ও অনুভূমিক স্কেল 1 ইঞ্চি = 1 মাইল। এই মানচিত্রে ক ও খ এই দুই বিন্দুর সংযোগকারী রেখার উপর পরিলেখ অঙ্কণ করতে হবে।

1. প্রথমে সাদা কাগজে বা গ্রাফ কাগজে ক-খ রেখার সমান দৈর্ঘ্যের একটি রেখা টানা হল। অর্থাৎ, অঙ্কিত পরিলেখ ও মানচিত্রের অনুভূমিক স্কেল এক থাকবে। এই ভিত্তিরেখার উভয় প্রান্তে দুটি উলম্বরেখা টেনে তাতে নির্ধারিত উলম্ব স্কেলটি (1" = 1,000 ফুট) দেখানো হল।

2. এক টুকরো সাদা কাগজ ভাঁজ করে ক-খ রেখার উপর বসানো হল। এই ভাঁজ করা কাগজটির উপর কখ সরলরেখাকে সমোন্নতি রেখাগুলি যে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দুগুলিকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হল। প্রতিটি ছেদবিন্দুর সঙ্গে সমোন্নতি রেখাগুলির উচ্চতা লিখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। (চিত্র নং 1)

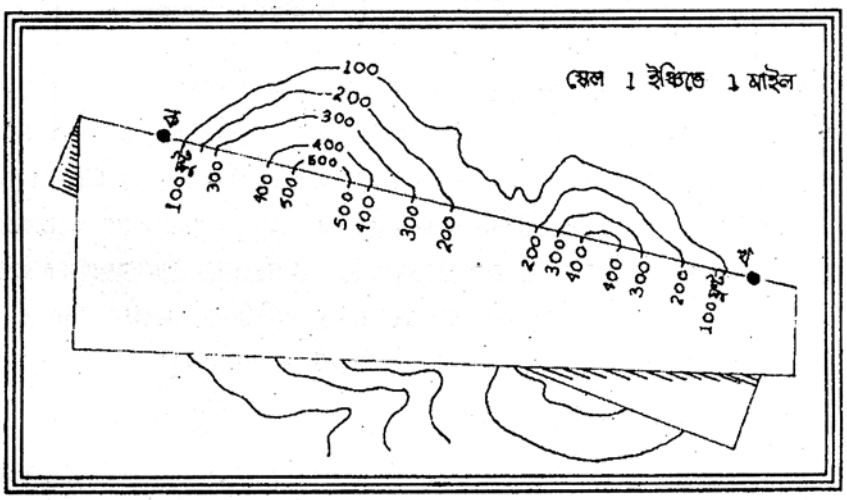

চিত্র : 1

3. এবার ক-খ রেখা বরাবর চিহ্নিত ছেদবিন্দুগুলি গ্রাফ কাগজ বা সাদা কাগজে টানা কখ রেখার উপর বসানো হল।

4. প্রতিটি ছেদবিন্দুর উচ্চতা নির্ধারিত উলম্ব স্কেল অনুযায়ী বসানো হল। উচ্চতাসূচক বিন্দুটি বসানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেটি কখ রেখায় অঙ্কিত ছেদবিন্দুর ঠিক উপরে। অর্থাৎ, লম্বভাবে থকে। এই উচ্চতাসূচক বিন্দুগুলি থেকে কখ রেখা পর্যন্ত একটি লম্বরেখা টানা যেতে পারে।

5. এবার প্রাপ্ত বিন্দুগুলি একটি সূক্ষ্ম সুষমরেখাদ্বারা যুক্ত করলে যে চিত্রটি পাওয়া যাবে তাকেই পরিলেখ বলা হয়।

6. অঙ্কণের পর যথার্থভাবে অনুভূমিক স্কেল উলম্ব স্কেল ও উলম্ব বৃদ্ধি ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রয়োজন অনুসারে উল্লেখ করতে হবে। (চিত্র নং 2)

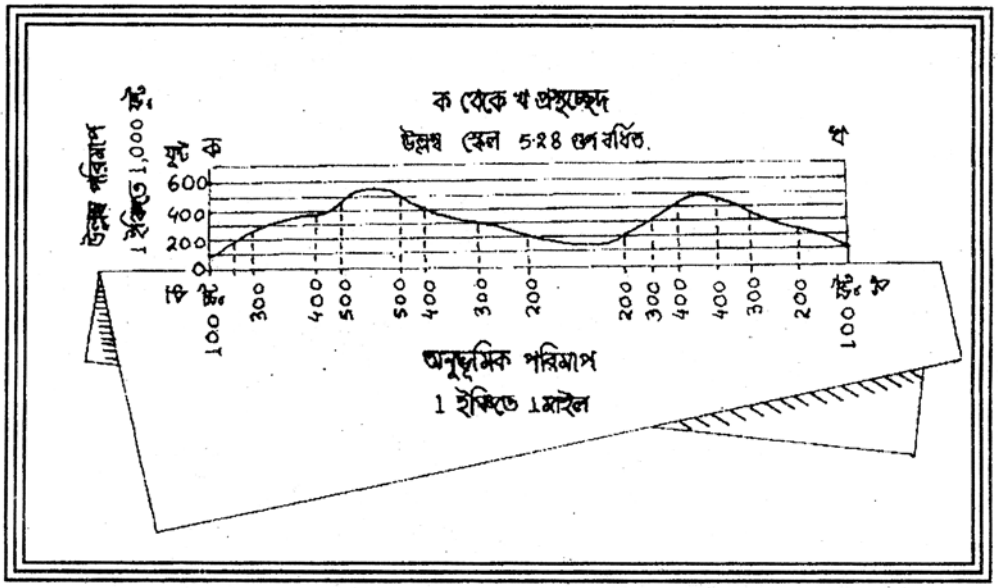

চিত্র : 2

ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করে স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র থেকে পরিলেখ অঙ্কণ করা সম্ভব। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র থেকে পরিলেখ অঙ্কণের সময় স্থান নির্বাচন ও ভিত্তিরেখাটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। অবশ্যই এমন অঞ্চল পরিলেখ অঙ্কণের জন্য নির্বাচিত করতে হবে যেটি সমগ্র অঞ্চলের প্রতিভূ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং অঙ্কিত ভিত্তিরেখাসমূহকে অবশ্যই ভূগঠনের সঙ্গে আড়াআড়ি হতে হবে। পরিলেখ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন সারিবদ্ধ পরিলেখ (Serial Profiles), অধ্যারোপিত পরিলেখ (Super imposed Profile), বিমিশ্র পরিলেখ (Composite Profile) ও অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ (Projected Profile)। নিম্নে এই পরিলেখগুলি সম্পর্কে ও তাদের অঙ্কণ পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

9.3.2 সারিবদ্ধ পরিলেখ (Serial Profile) ঃ

পরিলেখ কোন একটি বিশেষ রেখা (ভিত্তিরেখা) বরাবর ভূমিরূপকে পরিস্ফুট করে তোলে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূমিরূপকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য একটিমাত্র পরিলেখ যথেষ্ট নয় সেখানে সারিবদ্ধ পরিলেখ অঙ্কণ করা হয়। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে নির্বাচিত অঞ্চলটির উপর সমদূরত্বে পর পর বেশ কয়েকটি ভিত্তিরেখা (Baseline) অঙ্কণ করতে হবে। পূর্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে ঐ ভিত্তিরেখাগুলি বরাবর পরিলেখ অঙ্কণ করতে হবে। পরিলেখগুলি একই উলম্ব স্কেল অনুযায়ী একটি কাগজে পর পর সারিবদ্ধভাবে অঙ্কণ করতে হবে। অঙ্কণ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মানচিত্রে অঙ্কিত ভিত্তিরেখার সারিটি রক্ষিত হয়। অর্থাৎ মানচিত্রে যদি দক্ষিণ থেকে উত্তরে পর পর ভিত্তিরেখাগুলি অঙ্কিত হয় তাহলে সারিবদ্ধ পরিলেখেও অনুরূপভাবে পরিলেখগুলি সজ্জিত হবে। এইরূপ সারিবদ্ধ পরিলেখ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ পরিস্ফুট করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন, মালভূমির প্রান্তভাগ, নদী উপত্যকার আকৃতি, অভিক্ষিপ্ত স্পার ইত্যাদি। ভারত

চিত্র : ৩

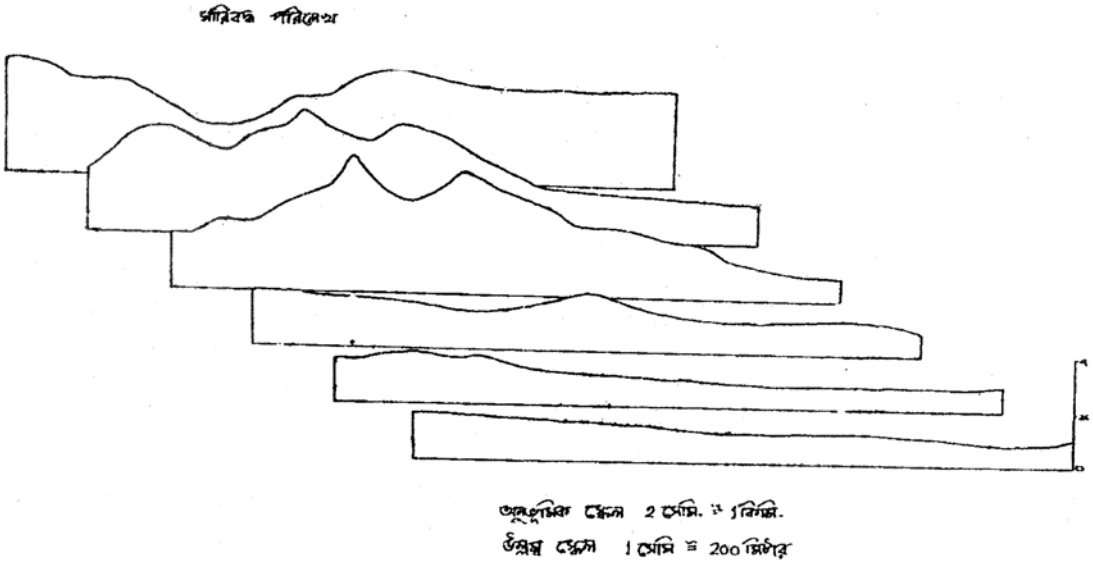

9.3.3 অধ্যারোপিত পরিলেখ (Superimposed profile) ঃ

কোন একটি অঞ্চলের ভূমিরূপ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করার জন্য অধ্যারোপিত পরিলেখ একটি বিশেষ সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর দিয়ে সমদূরত্বে টানা পরিলেখগুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা বা সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। এই সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য সমদূরত্বে অঙ্কিত পরিলেখগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তিরেখার বদলে একটিমাত্র ভিত্তিরেখার উপর অঙ্কণ করতে হবে, যাতে অঙ্কণের পর মনে হয় একটি পরিলেখের উপর অপরটি এবং তার উপর অন্যটি আরোপিত হয়েছে। (চিত্র ঃ 4a) যদি

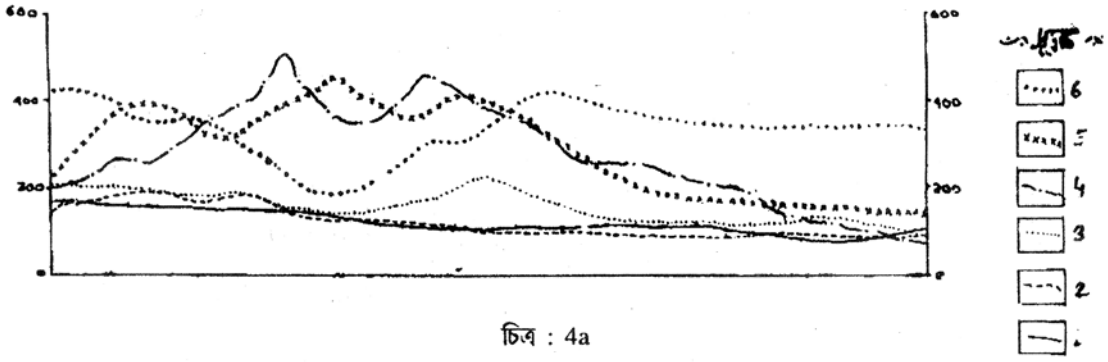

চিত্র : 4a

অঞ্চলটির ভূমিরূপগত সাদৃশ্য থাকে তাহলে অধ্যারোপিত পরিলেখ থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে। যেমন—সমোর শিখরতল (accordantsumit levels), ক্ষয়প্রাপ্ত সমপ্রায় অধিত্যকা (erosional platform) প্রভৃতি। এইরূপ পরিলেখের সাহায্যে কোন সমধর্মী ভূমিভাগ চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু যদি ভূমিভাগ সমধর্মী না হয় এবং সেখানে কোন সমোচ্চ শিখরতল না থাকে তাহলে বিমিশ্র পরিলেখ একটি গোলমেলে ধারণার সৃষ্টি করে এবং তা থেকে ভূমিরূপ সম্পর্কে কোনই ধারণা করা সম্ভব নয়।

9.3.4 বিমিশ্র বা একীকৃত পরিলেখ (Composite Profile) ঃ

কোন একটি অঞ্চল থেকে দূরবর্তী দিগন্তকে (Skyline) যেমন দেখা যায় বিমিশ্র বা একীকৃত পরিলেখে তা দেখানো হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিলেখের কেবলমাত্র উচ্চতম অংশটি যেটি দিগন্তরেখা তৈরী করছে সেটি নেওয়া হয়। বিমিশ্র পরিলেখ অঙ্কণ করার দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথম এবং একটু দীর্ঘায়ত পদ্ধতিটি হল এক সারি সারিবদ্ধ পরিলেখ অঙ্কণ করে ঐ পরিলেখগুলির সাহায্যে একটি অধ্যারোপিত পরিলেখ অঙ্কণ করতে হবে। তারপর অধ্যারোপিত পরিলেখটির সর্বোচ্চ অংশগুলিকে নিয়ে বিমিশ্র পরিলেখটি অঙ্কণ করতে হবে। (চিত্র ঃ 4b)

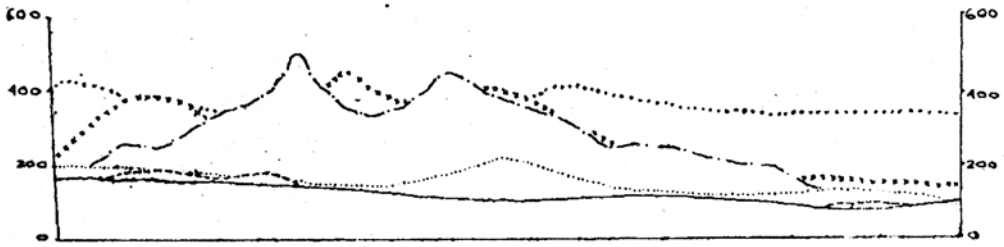

চিত্র : 4b

কিন্তু এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ। আমরা যদি কোন অঞ্চলের শুধুমাত্র বিমিশ্র পরিলেখ অঙ্কণ করতে চাই তাহলে কোন অঞ্চলের ভূগঠনের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে কতগুলি পরস্পর সমান্তরাল ভিত্তিরেখা নেওয়া হল। এবার এক টুকরো কাগজ একদম বাইরের সমান্তরাল ভিত্তিরেখার উপর সোজা করে বসিয়ে একটি সেট স্কোয়ার ঐ রেখাটি বরাবর ধীরে ধীরে সরিয়ে প্রত্যেকটি ভিত্তিরেখার উচ্চতম বিন্দুগুলি চিহ্নিত করে তার পাশে উচ্চতাটা লিখে নিতে হবে। এবার উচ্চতম বিন্দুগুলি একটিমাত্র ভিত্তিরেখার উপর বসালেই বিমিশ্র পরিলেখ পাওয়া যাবে।

কোন একটি অঞ্চলের উপর পর পর কতগুলি বিমিশ্র পরিলেখ অঙ্কণ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা যেতে পারে। কোন একটি অঞ্চলকে কতগুলি অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে বিমিশ্র পরিলেখ অঙ্কণ করা যেতে পারে। তারপর ঐ বিমিশ্র পরিলেখ অনুসারে কতগুলি কার্ডবোর্ড কেটে নিলে ঐ অঞ্চলের ভূমিরূপের একটি মডেল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

9.3.5 অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ (Projected Profile) ঃ

অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ প্রকৃতপক্ষে অধ্যারোপিত পরিলেখের অন্যরূপ। এখানে শুধুমাত্র পরিলেখগুলির সেই অংশ অঙ্কণ করা হয় যা দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন মধ্যবর্তী উচ্চ ভূভাগ দ্বারা পরিলেখগুলি দৃশ্যতঃ বাধাপ্রাপ্ত না হয়। ফলে এর সাহায্যে পারিপার্শ্বের একটি সামগ্রিক ও অবাধ দৃশ্য পাওয়া যায়। (চিত্র ঃ 4C)

বিমিশ্র পরিলেখ

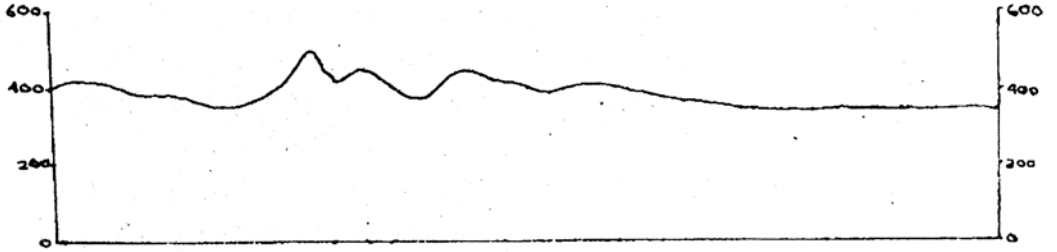

চিত্র : 4c

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র পাঠ করার সময় ভূমিরূপ সংক্রান্ত সঠিক ধারণা লাভের জন্য এই সকল পরিলেখ অঙ্কণ করা হয়। সাধারণতঃ একটি নির্বাচিত অংশের সারিবদ্ধ পরিলেখ, অধ্যারোপিত পরিলেখ, বিমিশ্র পরিলেখ ও অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ অঙ্কণ করা হয়। এইভাবে অঙ্কিত পরিলেখসমূহ একটি অঞ্চলের ভূমিরূপ ও ভূমিদৃশ্য সম্পর্কে সঠিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা লাভে সাহায্য করে।

9.4 আপেক্ষিক ভূমিরূপ (Relative Relief)

স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র থেকে ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক **ভূমিরূপ** (Relative Relief) উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভূমিরূপের পার্থক্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমিরূপের বিস্তার (amplitude) নির্ধারণ করা হয়। জি. এইচ্. স্মিথ প্রথম ভূমিরূপ বিশ্লেষণে আপেক্ষিক ভূমিরূপের ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীকালে বহু ভূমিরূপবিদ্ এই পদ্ধতির সফল ব্যবহার করেন।

9.4.1 আপেক্ষিক ভূমিরূপ নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রয়োজনীয়তা ঃ একটি স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র বা Topo map নেওয়া হল। ঐ মানচিত্রে নির্বাচিত অংশের উপর কতগুলি সমান আকৃতির বর্গাকার গ্রীড কাটা হল। এই গ্রীডগুলি যে কোন মাপেরই নেওয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই গ্রীডের আকৃতি যত ছোট হবে ততই সূক্ষ্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। সাধারণতঃ টোপো মানচিত্রে 1 sq. km. বা 1 sq. mile আকৃতির বর্গাকার গ্রীড অঙ্কণ করা হয়। এবার প্রত্যেকটি গ্রীডের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতা স্থির করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। সমোন্নতি রেখার মান দেখে এটি নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ একটি গ্রীডের মধ্য থেকে যতগুলি সমোন্নতি রেখা গিয়েছে তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নটির মান নেওয়া হয়। একটি সারণীর মধ্যে প্রাপ্ত মানগুলি লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। তারপর এক টুকরো কাগজে অনুভূমিক স্কেল ঠিক রেখে বা বড় করে গ্রীডগুলির মান বসিয়ে নিয়ে সমমানরেখা আঁকা হয়। এই সমমান রেখাগুলি অঞ্চলটিকে কতগুলি অঞ্চলে ভাগ করে যেখানকার **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** একই।

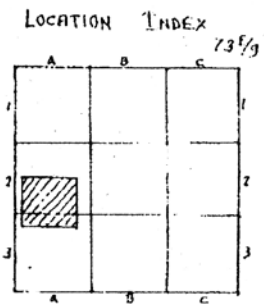

চিত্র : 5

এখানে উদাহরণস্বরূপ $73\frac{E}{9}$ টোপো মানচিত্রের একটি অংশের (চিত্র ঃ 5) **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** দেখানো হয়েছে এবং চিত্রটি (চিত্র ঃ 6) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে যে অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অসমতল ও উচ্চ সেখানকার **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** অধিক এবং যেখানকার ভূমিরূপ নিম্ন বা সমপ্রায় সেখানকার আপেক্ষিক ভূমিরূপ অল্পমান যুক্ত। অতএব আপেক্ষিক ভূমিরূপের পাঠ থেকে আমরা কোন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। তবে এই পদ্ধতির একটাই অসুবিধা হল এই যে, এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ উচ্চতা ও সর্বনিম্ন উচ্চতা কখনো একটি গ্রীডের দু'প্রান্তে হতে পারে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে দূরত্ব সর্বাধিক হতে পারে; আবার যদি ভৃগু (Cliff) হয় তাহলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উচ্চতার মধ্যে দূরত্ব লাও থাকতে পারে। এই বিষয়টি বিশ্লেষণের কোন জায়গা এই পদ্ধতিতে নেই।

কোন একটি অববাহিকা অঞ্চলের **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** চিত্র করে অববাহিকার মোট আয়তন ও বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক ভূমিরূপের অন্তর্গত অঞ্চলের আয়তন নির্ণয় করে শতকরা হিসেবের সাহায্যে বের করা যেতে পারে প্রতিটি শ্রেণীর গুরুত্ব।

9.5 ব্যবচ্ছেদনের সূচক (Dissection Index)

কোন অঞ্চলের ভূমিরূপের পঠন, পাঠন ও বিশ্লেষণে ব্যবচ্ছেদনের সূচক বা dissection index একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আপেক্ষিক ভূমিরূপ ও সর্বোচ্চ ভূমিরূপের হারকেই বলা হয় ব্যবচ্ছেদনের সূচক। যদিও ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন ভূমিরূপবিদ্‌গণ রেখেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ডোভ নির (Dov Nir, 1957) কর্তৃক প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যবচ্ছেদনের সূচক বার করার সূত্রটি হল—

$$DI = \frac{R_R}{A_R}$$

যেখানে R_R হচ্ছে **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** আর A_R হচ্ছে চরম বা **সর্বোচ্চ ভূমিরূপ**। যেহেতু **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভূমিরূপের পার্থক্য)-কে **সর্বোচ্চ ভূমিরূপ** দিয়ে ভাগ করা হয়। তাই ব্যবচ্ছেদনের সূচক সবসময়ই 1 এর কম হয় এবং **সর্বোচ্চ** হয় 1। 1 হওয়া তখনই সম্ভব যখন সর্বনিম্ন ভূমিরূপের মান 0 হয় ফলে **আপেক্ষিক ভূমিরূপ** ও চরম বা **সর্বোচ্চ ভূমিরূপের** মান সমান হয়।

আপেক্ষিক ভূমিরূপ

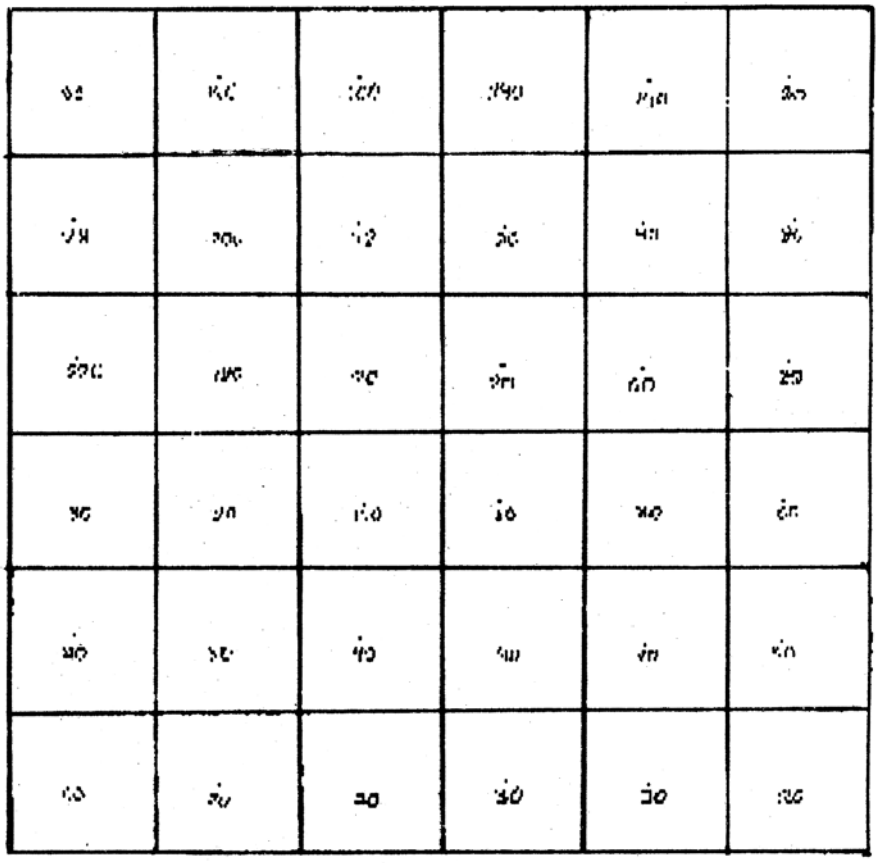

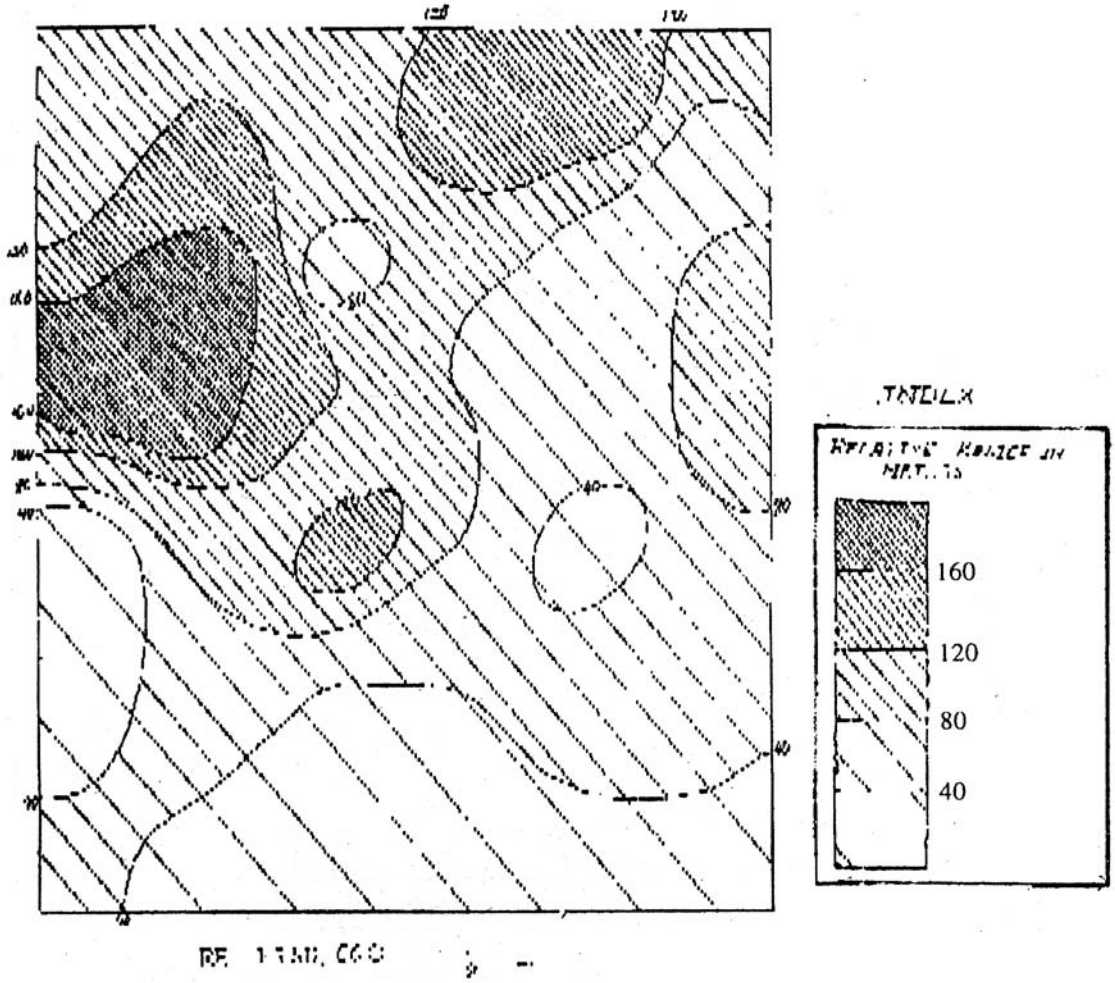

চিত্র : 6

9.5.1 ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ

ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয়ের জন্যও গ্রীড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের নির্বাচিত অংশে বর্গাকার গ্রীড অঙ্কণ করে নিতে হয়। এই গ্রীডগুলি যদিও যে কোন মানেই করা সম্ভব তবুও সাধারণতঃ 1 স্কোয়ার মাইল বা 1 স্কোয়ার কিমি মাপের গ্রীডই সর্বাধিক ব্যবহৃত। এবার প্রত্যেকটি গ্রীডের সমোন্নতি রেখার মানের সাহায্যে আপেক্ষিক ভূরিূপ ও চরম ভূমিরূপ নির্ণয় করে সূত্রানুসারে ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয় করে একটি সারণীতে লিপিবদ্ধ করা হল (সারণী-1)। এক টুকরো কাগজে গ্রীড অঙ্কণ করে প্রত্যেকটি গ্রীডের মধ্যবিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে সূচকটি লিখে নিয়ে সমমান রেখা টানা হল (চিত্র ঃ 7a, b)। চিত্র সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। ব্যবচ্ছেদনের সূচক অত্যন্ত কম (very low) 0-0.1-এর মধ্যে, কম (low) 0.1-0.2-এর মধ্যে, মধ্যম (Moderate) 0.2-0.3-এর মধ্যে, বেশী (High) 0.3-0.4-এর মধ্যে এবং অত্যন্ত বেশী (very high) > 0.4।

সারণি-1

ব্যবচ্ছেদিকরণের সূচক

(Dissection Index)

গ্রীড সংখ্যা	আপেক্ষিক ভূমিরূপ	চরম বা সর্বোচ্চ ভূমিরূপ	ব্যবচ্ছেদিকরণের হার
A_1	90	630	0.142
A_2	128	668	0.191
A_3	220	650	0.338
A_4	30	430	0.069
A_5	30	430	0.069
A_6	50	420	0.119
B_1	120	600	0.200
B_2	200	620	0.322
B_3	180	610	0.295
B_4	90	500	0.180
B_5	50	410	0.121
B_6	20	400	0.050
C_1	100	590	0.169
C_2	52	552	0.094
C_3	120	580	0.206
C_4	150	558	0.268
C_5	40	420	0.095
C_6	20	430	0.046
D_1	140	600	0.233
D_2	90	530	0.169
D_3	80	510	0.156
D_4	80	510	0.156
D_5	40	430	0.093
D_6	30	400	0.075
E_1	140	590	0.237
E_2	40	460	0.086

গ্রীড সংখ্যা	আপেক্ষিক ভূমিরূপ	চরম বা সর্বোচ্চ ভূমিরূপ	ব্যবচ্ছেদিকরণের হার
E_3	60	450	0.133
E_4	30	420	0.071
E_5	70	420	0.166
E_6	30	400	0.075
F_1	80	510	0.156
F_2	80	530	0.150
F_3	89	469	0.189
F_4	50	450	0.111
F_5	50	350	0.142
F_6	20	350	0.057

ব্যবচ্ছেদনের সূচক

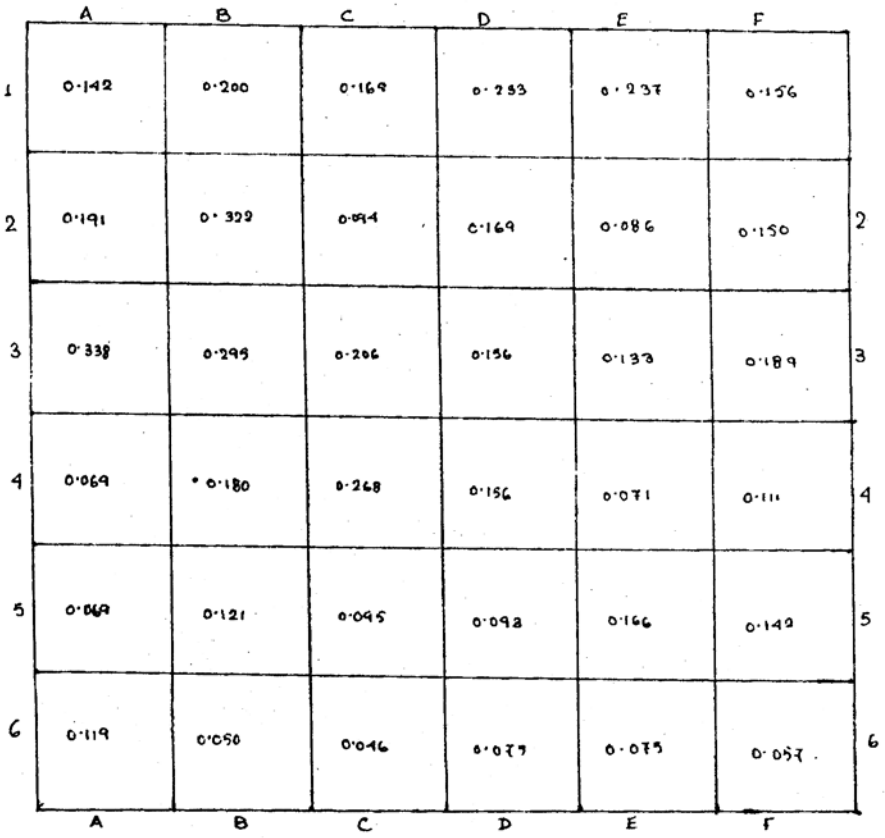

চিত্র : 7a

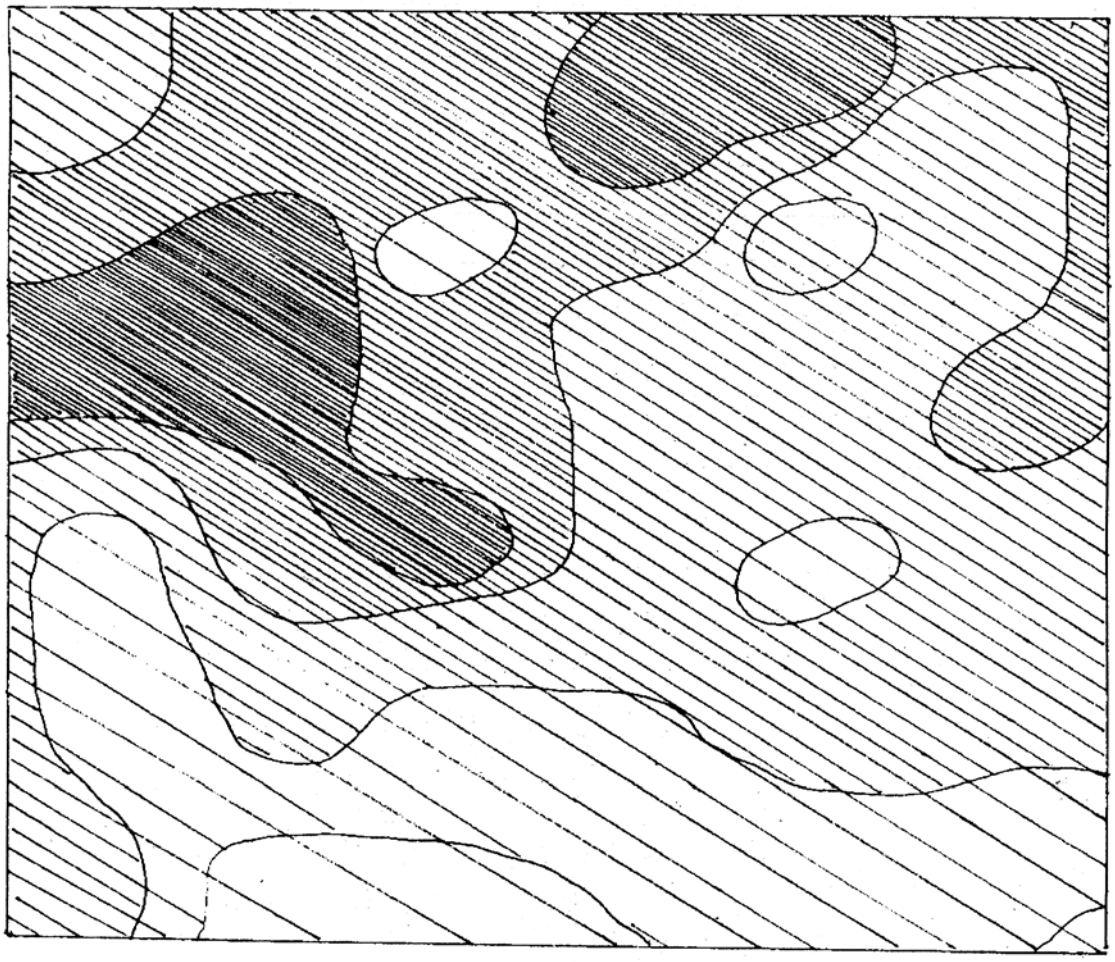

চিত্র : 7b

9.5.2 ব্যবচ্ছেদনের সূচকের প্রয়োজনীয়তা ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূমিরূপের পঠন-পাঠনে ব্যবচ্ছেদনের সূচক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণবাবে ভূমিরূপের বন্ধুরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় এই সূচকের সাহায্যে। ব্যবচ্ছেদনের সূচক যদি নিম্ন হয় তাহলেই বুঝতে হবে ভূমিরূপের বন্ধুরতা কম এবং সূচক যদি বেশী হয় তাহলে বন্ধুরতা বেশী। একটা ভূমিরূপ ক্ষয়চক্রের কোন পর্যায়ে আছে তাও বুঝতে পারা যায় এই ব্যবচ্ছেদনের সূচকের সাহায্যে। সাধারণতঃ 0.1-

এর কম সূচক ক্ষয়চক্রের বার্ধক্য অবস্থা, 0.1 থেকে 0.3 সূচক ক্ষয়চক্রের প্রবীন অবস্থা এবং 0.3-এর অধিক সূচক ক্ষয়চক্রের যৌবন অবস্থাকে নির্দেশিত করে।

9.6 নদীর ক্রমবিন্যাস (Stream Order)

"Stream Order is defined as a measure of the position of a stream in the hierarchy of tributaries." (L. B. Leopold , M. G. Wobman and J. P. Miller (1969). কোন একটি নদী অববাহিকার নদী ও উপনদীসমূহকে একটি ক্রমানুসারে সজ্জিত করাকেই নদীর ক্রমবিন্যাস বলা হয়। নদী অববাহিকা পর্যালোচনায় এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। নদীর ক্রমবিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলি সর্বজনগ্রাহ্য এবং বহুল ব্যবহৃত। নিম্নে পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল।

9.6.1 হর্টনের নদীর ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি (Horton's Scheme of Stream Ordering) ঃ

আর. ই. হর্টন (R. E. Horton) একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার। তিনি 1932 ও 1945 খ্রীস্টাব্দে নদীর ক্রমবিন্যাসের একটি পদ্ধতি প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতে প্রথম ক্রমের নদী (1st order stream)। সেগুলিকে বলা হয় যেগুলির কোন উপনদী চাই। দ্বিতীয় ক্রমের নদী হল সেগুলি যারা উপনদী হিসেবে প্রথম ক্রমের নদীগুলিকে পাচ্ছে। অর্থাৎ দু'টি প্রথম ক্রমের নদী মিলিত তৈরী করছে একটি দ্বিতীয় ক্রমের নদী (2nd order stream)। দ্বিতীয় ক্রমের নদীটি চিহ্নিত করার পর একে মস্তকের দিকে বর্ধিত করতে হবে এবং প্রথম ক্রমের নদী দুটির মধ্যে যদি দীর্ঘতম তার উৎস পর্যন্ত এটিকে বর্ধিত করা হবে। আবার দুটি দ্বিতীয় ক্রমের নদী মিলিত হয়ে তৈরী করবে একটি তৃতীয় ক্রমের নদী (3rd order stream এবং এই তৃতীয় ক্রমের নদীটিকেও মস্তকের দিকে বর্ধিত করে দীর্ঘতম দ্বিতীয় ক্রমের নদীর উৎস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। (চিত্র ঃ 8) এই তৃতীয় ক্রমের নদী উপনদী হিসেবে দ্বিতীয় ও প্রথম ক্রমের নদী পাবে। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমিক সংখ্যা বসানো চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত অববাহিকার দীর্ঘতম নদীটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ ক্রমে (highest order) স্থাপিত হচ্ছে।

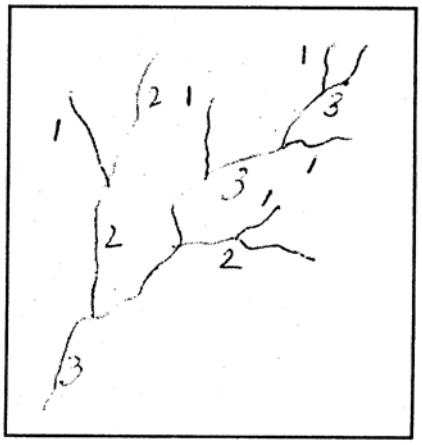

চিত্র 8 : হর্টনের নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি

উদাহরণ হিসেবে এখানে ভারতীয় জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত $73\frac{E}{9}$ স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের অন্তর্গত একটি নদী অববাহিকার হর্টনের পদ্ধতি অনুসারে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে (চিত্র ঃ 9)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ≃ চিহ্নটি যেটা সর্বোচ্চক্রম দেখাচ্ছে সেটি অববাহিকার দীর্ঘতম নদী। এই পঞ্চম ক্রমের নদীটি (5th order stream) যথাক্রমে চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম ক্রমের নদী উপনদী হিসেবে পেয়েছে।

হর্টনের পদ্ধতিটি যদিও বহুল ব্যবহৃত তবুও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পদ্ধতিটি একটু জটিল ও সময় সাপেক্ষ। কারণ এখানে প্রকৃতপক্ষে দুবার ক্রমবিন্যাস করতে হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম ক্রমের নদী, দ্বিতীয় ক্রমের

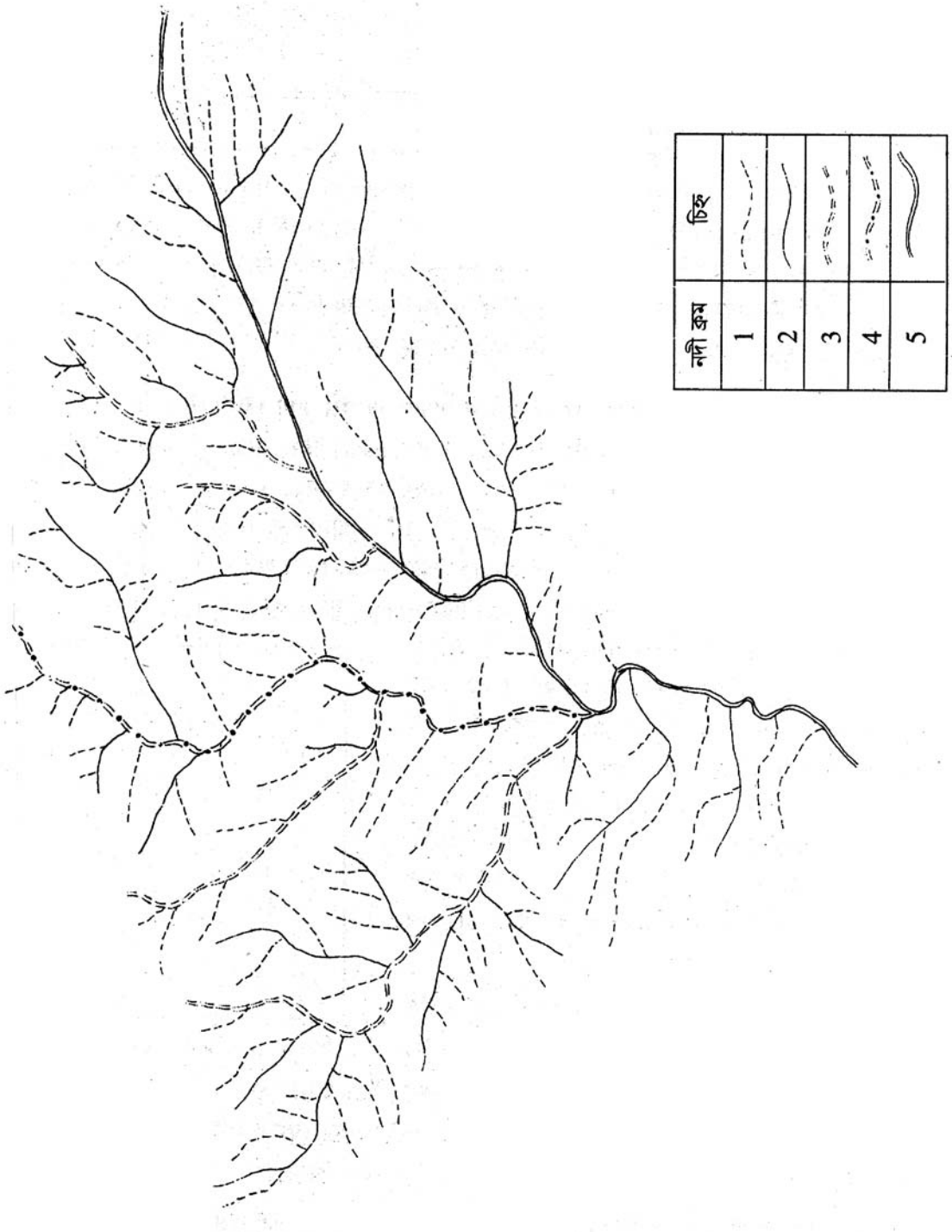

চিত্র 9 : নদীর ক্রমবিন্যাস (হর্টনের পদ্ধতি অনুসারে)

নদী, তৃতীয় ক্রমের নদী ইত্যাদি চিহ্নিত করার পর পরবর্তী পর্যায়ে দৈর্ঘ্য অনুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ....ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রমের নদীগুলি মস্তকের দিকে বর্ধিত করতে হচ্ছে। (চিত্র 10) এই পুনঃশ্রেণীবিভাগকরণ ও পুনঃগণনা হর্টনের পদ্ধতির একটি অসুবিধা। যেখানে দুটি নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেখানে যে কোন একটির উৎস পর্যন্ত বর্ধিত করা চলে। অর্থাৎ যেখানে দুটি প্রথম ক্রমের নদীর দৈর্ঘ্যর পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে সেখানে দ্বিতীয় ক্রমের নদীটি মস্তকের দিকে বর্ধিত করার সময় যে কোন একটি উৎস পযন্ত বর্ধিত করলেই চলবে। ফলে একই দৈর্ঘ্য ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি নদী অনেক সময় ভিন্ন ক্রম পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

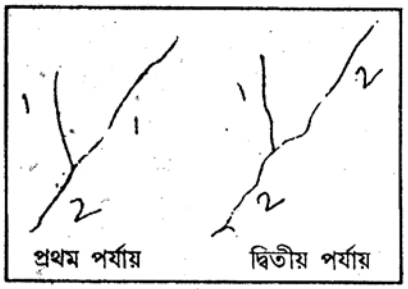

চিত্র 10 :

9.6.2 স্ট্রলার কৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি (Strahler's Scheme of Stream Ordering) ঃ

এ. এন. স্ট্রলার (1952, 1953, 1957) নদী ক্রমবিন্যাসের এক নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিতে স্ট্রলার হর্টনকৃত ক্রমবিন্যাসের পর প্রত্যেকটি নদীকে তার নিম্নক্রমের দীর্ঘতম নদীটির উৎস পর্যন্ত বর্ধিত করার রীতিটি ত্যাগ করেন। এছাড়া ক্রমবিন্যাসের পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে হর্টনের অনুরূপ। এখানে দুটি প্রথম ক্রমের নদী (অর্থাৎ যে নদীর কোন উপনীদ নেই) সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বিতীয় ক্রমের নদী সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় ক্রমের নদীটি নিম্নদিকে চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত অপর একটি দ্বিতীয় ক্রমের নদীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে যে বিন্দুর পর থেকে শুরু হয় তৃতীয় ক্রমের নদী। এই পদ্ধতি চলতে থাকে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতেও একটি তৃতীয় ক্রমের নদী দ্বিতীয় ও প্রথম ক্রমের নদী উপনদী হিসেবে পেতে পারে এবং একটি চতুর্থ ক্রমের নদী তৃতীয় ক্রমের, দ্বিতীয় ক্রমের ও প্রথম ক্রমের নদী উপনদী হিসেবে পেতে পারে। (চিত্র ঃ 11) স্ট্রলারের পদ্ধতিকে সাধারণভাবে 'Stream Segment Method' বলা হয়।

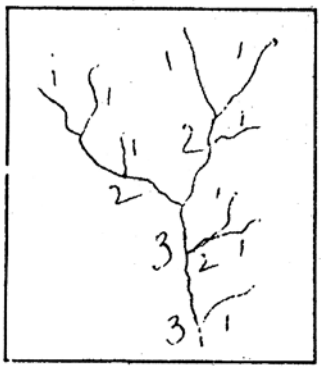

চিত্র 11 : স্ট্রলার কৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি

এখানে উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত $73\frac{E}{9}$ স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের একই অববাহিকার নদী ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে স্ট্রলারের পদ্ধতি অনুসারে (চিত্র ঃ 12)। চিত্র ঃ 2 এবং চিত্র ঃ 5-এর পারস্পরিক তুলনা করলে এই পদ্ধতি দুটির পার্থক্য ও মিল সহজেই চোখে পড়ে।

স্ট্রলারের পদ্ধতি অত্যন্ত সরল এবং সহজে প্রয়োগ করা যায়। এখানে মূল নদীটি উৎস থেকে বরাবর একই ক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় না যা সাধারণতঃ হর্টনের পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এখানে নদীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে হর্টন ও স্ট্রলার উভয়ের পদ্ধতিতেই সর্বোচ্চ ক্রমটি একই থাকে তার কোন বদল হয় না। তবে এই পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল এই যে কোন ক্রমের নদী যদি তার পরবর্তী উচ্চ ক্রমের নদীর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে ক্রমসংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যদি একই ক্রমের নদীর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে ক্রমসংখ্যার পরিবর্তন করতে সক্ষম। হর্টনের পদ্ধতিতেও এই একই ত্রুটি বিদ্যমান।

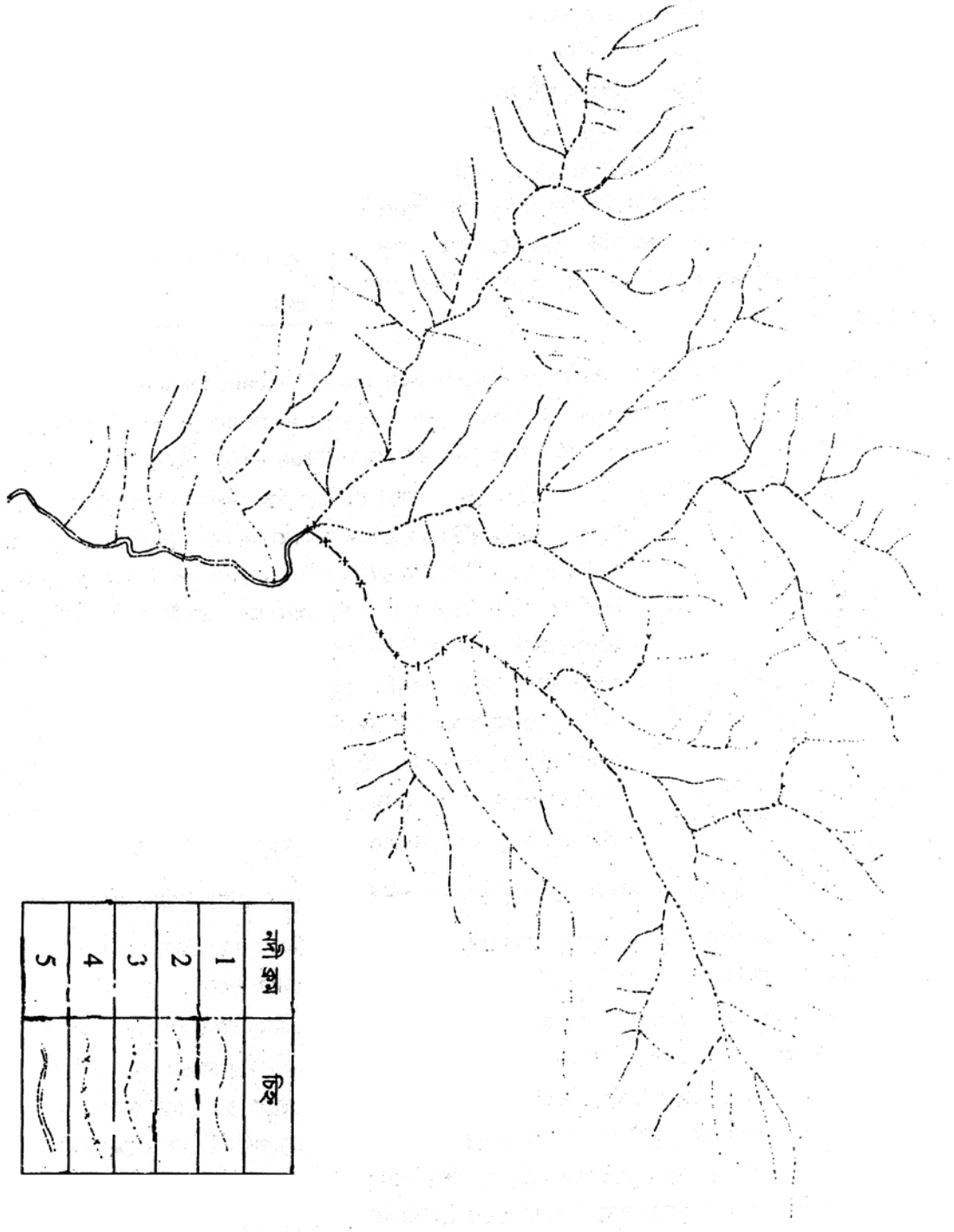

চিত্র 12 : নদীর ক্রমবিন্যাস (স্ট্রলারের পদ্ধতি অনুসারে)

9.6.3 শ্রীভকৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি (Shreve's Stream Link Magnitude Method) ঃ

শ্রীভকৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি সাধারণভাবে Stream Link Magnitude Method নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে একটি নদী অববাহিকার সমস্ত নদীসমূহকে একটি মাত্রা (Magnitude) দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নদীতন্ত্রের সঙ্গে বাইরের সংযোগকারী নদীসমূহকে অর্থাৎ যে প্রবাহগুলি সমগ্র নদী গোষ্ঠীতে জল আনছে তাদের প্রথম ক্রমের নদী বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এই নদীগুলিকে 1 মাত্রা দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ের সমস্ত নদীকে যে ক্রমের নদী মিলিত হয়ে নদীটি সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাত্রা যুক্ত করে যে মাত্রা পাওয়া যায় সেটি দেওয়া হয়। যেমন যদি প্রথম ক্রমের দুটি নদী যুক্ত হয় তার মাত্রা হবে 2। এরপর তার সাথে যদি একটি প্রথম ক্রমের 1 মাত্রা বিশিষ্ট নদী যুক্ত হয় তাহলে মিলন স্থলের পর থেকে নদীটির মাত্রা হবে 3। যদি দুটি দ্বিতীয় ক্রমের নদী অর্থাৎ যাদের মাত্রা 2 যুক্ত হয় তাহলে মিলিত নদীটির মাত্রা হবে 4 (চিত্র ঃ 13)। অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে গিয়ে মূল নদীটির মাত্রা সর্বাধিক হবে এবং সেটি সকল সংযোগকারী নদীর মাত্রার সমষ্ঠি হবে। অর্থাৎ,

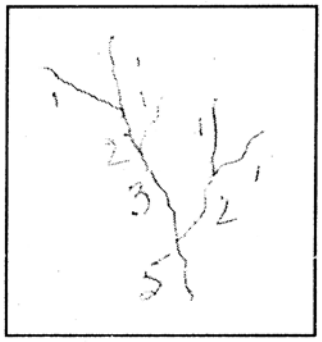

চিত্র 13 : শ্রীভ কৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি

$T_1 + T_1 = T_2$ (T_1 = প্রথম ক্রমের নদী

$T_2 + T_1 = T_3$ T_2 = দ্বিতীয় ক্রমের নদী

$T_2 + T_2 = T_4$ T_3 = তৃতীয় ক্রমের নদী

$T_4 + T_1 = T_5$ T_4 = চতুর্থ ক্রমের নদী, T_5 = পঞ্চম ক্রমের নদী)

.....এইভাবে চলবে। ফলে একটি নদী গোষ্ঠীর সর্বশেষ সদস্যটির মাত্রা বেশ বেশী হয়। এবং বড় নদী গোষ্ঠী হলে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক।

এখানে একই নদী অববাহিকার শ্রীভের পদ্ধতি অনুসারে নদী ক্রমবিন্যাস দেখানো হয়েছে (চিত্র ঃ 14) চিত্র ঃ 2, 5 এবং 7-এর মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করলে এই পদ্ধতির সাথে হর্টন এবং স্ট্রলারকৃত পদ্ধতির মিল ও অমিলগুলি সহজে চোখে পড়ে। হর্টন এবং স্ট্রলারে যেখানে সর্বোচ্চ নদী ক্রম হয়েছে 5 সেখানে শ্রীভকৃত পদ্ধতি অনুসারে সর্বোচ্চ নদী ক্রমের মাত্রা হয়েছে 135।

9.6.4 সেইডেগারকৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি (Scheidegger's Scheme of Stream Order) ঃ

সেইডেগারকৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। এখানে প্রথম পর্যায়ে নদী ক্রম নির্ধারণ করা হয় এবং তারপর নদীরমাত্রা (Magnitude) নির্ধারণ করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। অর্থাৎ সেইডেগারের পদ্ধতিকে স্ট্রলার ও শ্রীভ এর পদ্ধতি সমন্বয় বলা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে নদীর ক্রম সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এখানে প্রত্যেকটি প্রথম ক্রমের নদীকে ক্রমসংখ্যা 2 দেওয়া হয়। কারণ সেইডেগার মনে করেন যে, একটিমাত্র জলধারা একটি নদী সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। তাই তিনি প্রথম ক্রমের নদীর সূচকসংখ্যা 2 দিয়েছেন। দুটি প্রথম ক্রমের নদী মিলিত হয়ে সূচক সংখ্যা হবে 4। আবার এই দ্বিতীয়

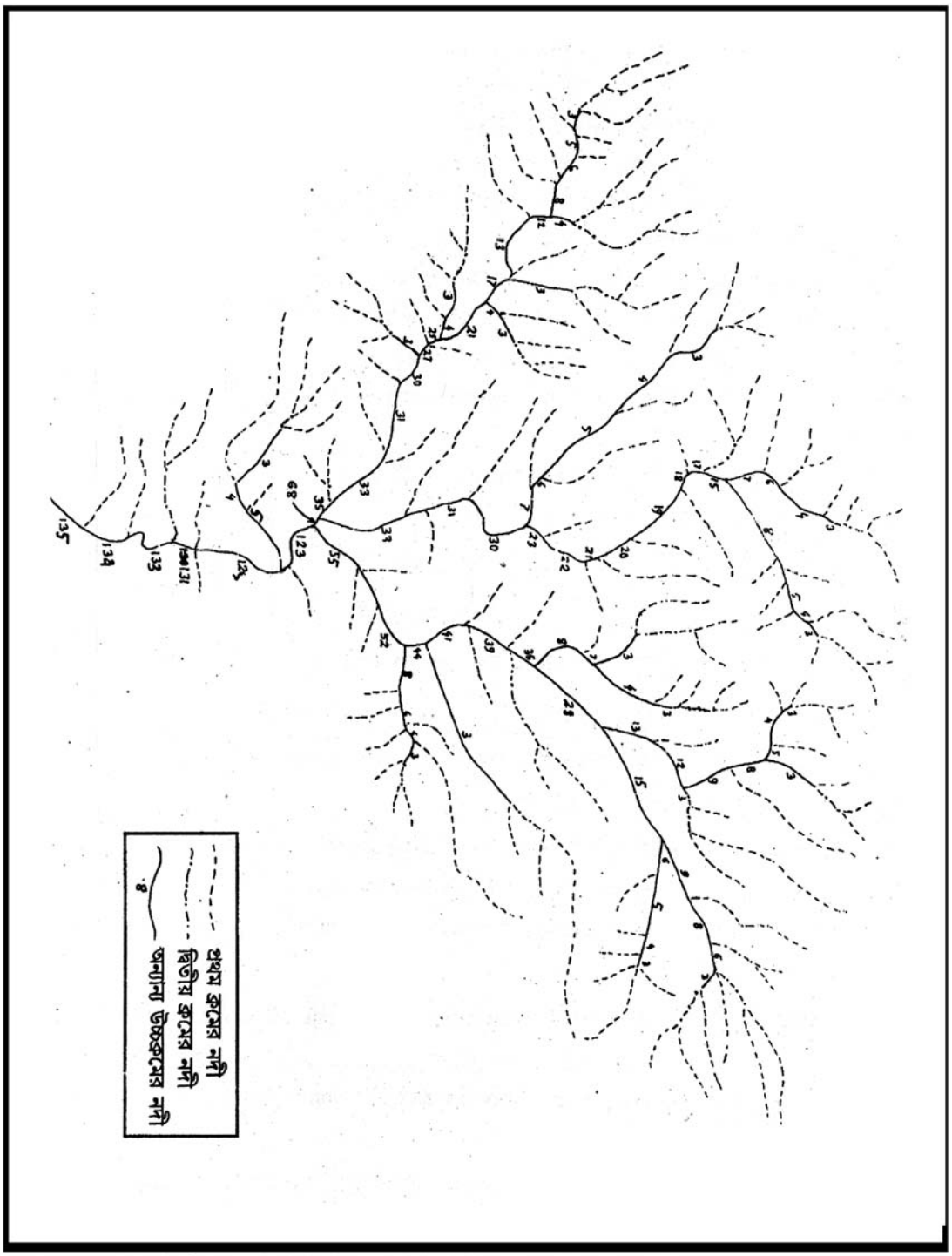

চিত্র 14 : নদীর ক্রমবিন্যাস (শ্রীভের পদ্ধতি অনুসারে)

ক্রমের নদী (সূচকসংখ্যা 4)-এর সাথে যদি একটি প্রথম ক্রমের নদী যুক্ত হয় তাহলে সূচকসংখ্যা হবে 6। অর্থাৎ ক্রমিকসংখ্যা নির্ধারমের ক্ষেত্রে শ্রীভ ও সেইডেগারের পদ্ধতিগত মিল রয়েছে। (চিত্র 15)। উভয়ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ক্রমসংখ্যা মূল নদীটি প্রাপ্ত হয় তবে এই সংখ্যাটি সেইডেগারের পদ্ধতি অনুসারে অত্যন্ত বেশী।

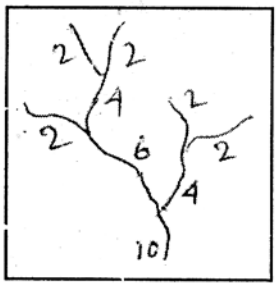

চিত্র 15 : সেইডেগার কৃত নদী ক্রমবিন্যাস পদ্ধতি

এখানে উদাহরণ হিসেবে যে চিত্রটি (চিত্র ঃ 16) সংযোজিত হয়েছে সেটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে যেখানে শ্রীভকৃত পদ্ধতিতে অববাহিকার মূল নদীটির সংখ্যা হয়েছে 135 সেখানে সেইডেগারকৃত পদ্ধতিতে মূল নদীটির ক্রমসংখ্যা 270।

অববাহিকাটির ক্রমবিন্যাস হয়ে গেলে পর মাত্রা (Magnitude) নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি সংযোগকারী মাত্রা নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে ঃ $M = \log 2^{2M^1}$ যেখানে

M হচ্ছে Desired Magnitude বা কাম্যমাত্রা এবং

M^1 হচ্ছে Magnitude of Exterior Links Considered as 1 বা নদীতন্ত্রের বহির্সংযোগকারী নদীগুলির মাত্রা যা সবসময় 1 ধরা হয়। এইভাবে মাত্রা নির্ধারমের ফলে ক্রমসংখ্যা 2 হয়। 4 হয় 2, 6 হয় 2.59, 10 হয় 3.59 ইত্যাদি।

যদিও সেইডেগারকৃত পদ্ধতির সাহায্যে নদীক্রম সম্পর্কে অনেক পরিষ্কার এবং নিখুঁত ধারণা লাভ করা সম্ভব তবুও এটি খুবই কম ব্যবহৃত হয় মূলত এর জটিলতার জন্য। এর সাহায্যে দ্বিধাবিভক্তির হার (bifurcation ratio) নির্ণয় করাও সম্ভব হয়।

9.6.5 নদীর ক্রমবিন্যাসের (Stream Ordering) প্রয়োজনীয়তা ঃ

একটি নদী অববাহিকার অন্তর্গত নদীসমূহের ক্রমবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ অববাহিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নদী ক্রমবিন্যাস যথেষ্ট সাহায্য করে। সাধারণভাবে নদীর ক্রমসংখ্যার সঙ্গে কোন একটি বিশেষ ক্রমের অন্তর্গত নদীর সংখ্যার সম্পর্ক ঋণাত্মক। নদীর ক্রমসংখ্যা যত বাড়বে একটি ক্রমের অন্তর্গত নদীর সংখ্যা তত কমবে। তাছাড়া কোন একটি বিশেষ ক্রমের অন্তর্গত নদীর সংখ্যা থেকে ঐ ক্রমের প্রত্যেকটি নদীর অববাহিকার আকার সম্পর্কে ধারণা করা যায়। একটি বিশেষ ক্রমের অন্তর্গত নদীর সংখ্যা যত বেশী হবে সেই ক্রমের অন্তর্গত নদীগুলির অববাহিকার আকৃতি তত ছোট হবে। কোন একটি নদী অববাহিকার ক্রমসংখ্যা (order number) সেই অববাহিকার আকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। যেমন যদি ক্রমসংখ্যা কম হয় অববাহিকার আকৃতি লম্বাটে (elongated) হবার সম্ভাবনা আবার যদি ক্রমসংখ্যা বেশী হয় তাহলে ডিম্বাকৃতি (oval) হবার সম্ভাবনা। এছাড়া নদীর ক্রমবিন্যাস থেকে নদী অববাহিকার ভূমিরূপ মৃত্তিকার প্রবেশ্যতা এবং অববাহিকা অঞ্চলের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা সম্ভব।

.6.6 দ্বিধাবিভক্তির হার (Bifurcation Ratio) ঃ

'Bifurcation ratio' বা দ্বিধাবিভক্তির হার আখ্যাটি হর্টন ব্যবহার করেন কোন একটি বিশেষ ক্রমের নদীর সংখ্যার সঙ্গে তার পরবর্তী নিম্নক্রমের নদীর সংখ্যার সম্পর্ককে বোঝাবার জন্য। দ্বিধাবিভক্তির হারের সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

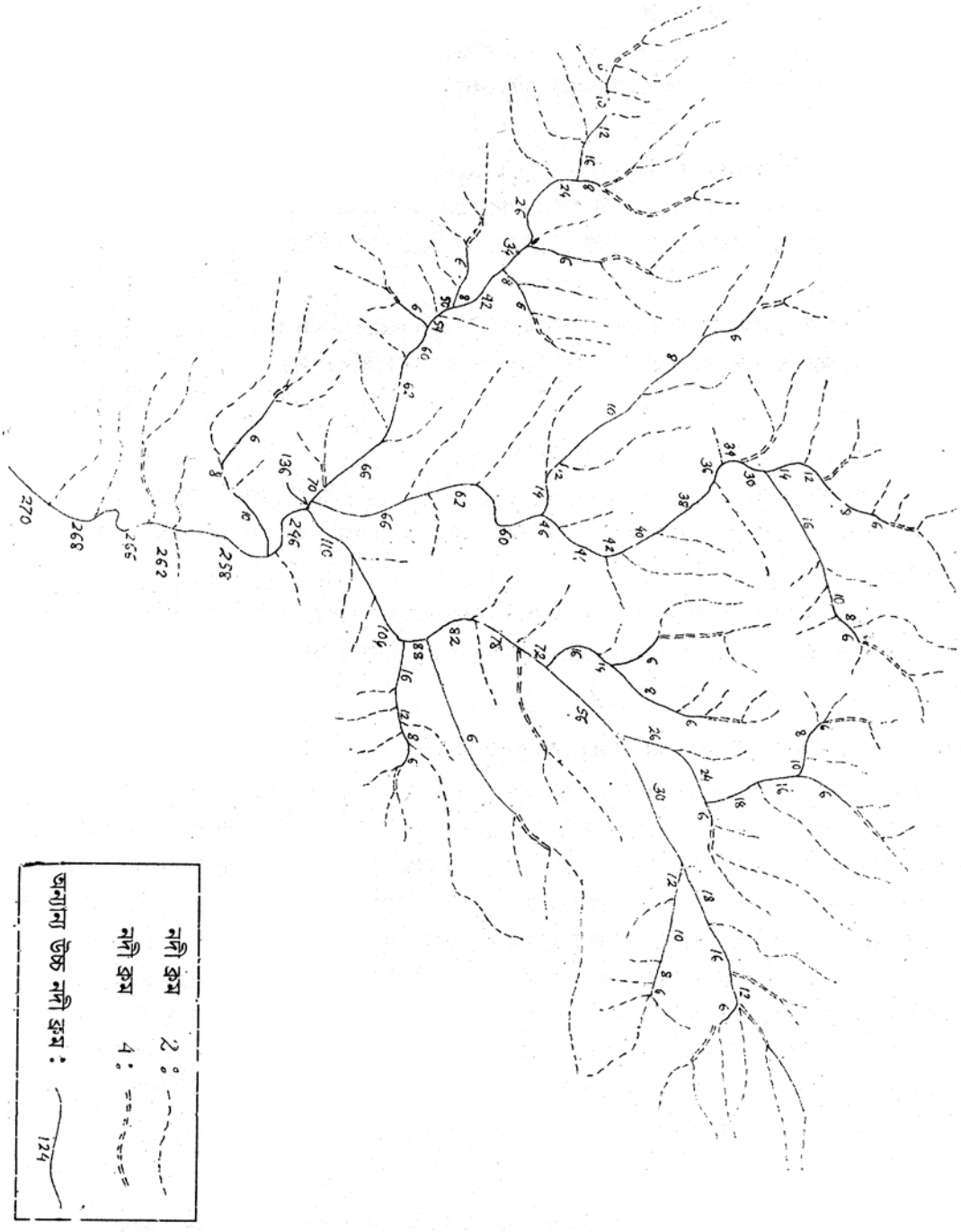

চিত্র :6 : নদীর ক্রমবিন্যাস (সেইডেগারের পদ্ধতি অনুসারে)

$$R_B = \frac{N_i}{N_i + 1}$$

যেখানে দ্বিধাবিভক্তির হার (Bifurcation Ratio) হচ্ছে R_B

N_i হচ্ছে কোন একটি বিশেষ ক্রমের নদীর সংখ্যা $N_i + 1$ হচ্ছে তার পরবর্তী নিম্নক্রমের নদীর সংখ্যা।

নিম্নে হর্টনের পদ্ধতি অনুসারে করা নদীর ক্রমবিন্যাস অনুসারে দ্বিধাবিভক্তির হার নির্ণয় করা হল।

নদীর ক্রম	নদীর সংখ্যা	দ্বিধাবিভক্তির হার
প্রথম ক্রমের নদী	132	5.08
দ্বিতীয় ক্রমের নদী	26	5.2
তৃতীয় ক্রমের নদী	5	2.5
চতুর্থ ক্রমের নদী	2	2
পঞ্চম ক্রমের নদী	1	

গড় 3.7

নদী অববাহিকার বিশ্লেষণে দ্বিধাবিভক্তির হারের (Bifurcation ratio) ভূমিকা ঃ দ্বিধাবিভক্তির হার থেকে কোন একটি নদী অববাহিকা সম্পর্কে বেশ কিছু পরোক্ষ ধারণা লাভ করা সম্ভব। হর্টনের মতে গড় দ্বিধাবিভক্তির হার 2.0 থেকে 3.0-4.0 পযন্ত হতে পারে। সাধারণত গড়ানো সমতল ভূমির ক্ষেত্রে এটি 2.0 হয় এবং পাহাড়ি বা ব্যবছিন্ন অঞ্চলে এটি 3.0 থেকে 4.0 হয়। (Horton, 1945) সাধারণভাবে গড় দ্বিধাবিভক্তির হার বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটি একইরকম থাকে, খুব সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে মোটামুটি একই গঠন ও শিলাযুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন নদী অববাহিকার দ্বিধাবিভক্তির হার মোটামুটি একইরকম ও বিভিন্ন গঠন শিলাযুক্ত অঞ্চলে দ্বিধাভিভক্তির হারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

9.7 জলনির্গম আভীক্ষ্য (Drainage Frequency)

জলনির্গম আভীক্ষ্য (Drainage Frequency) বা নদী আভীক্ষ্য (Stream Frequency) হচ্ছে প্রতি একক পরিমাণ ভূমিতে প্রাপ্ত নদীর সংখ্যা। জলনির্গম আভীক্ষ্য একটি সম্পূর্ণ অববাহিকার জন্য হিসেব করে বিভিন্ন অববাহিকার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। আবার বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য অববাহিকাকে কতগুলি গ্রীডে বা বর্গে (grid) ভাগ করে প্রত্যেকটি গ্রীডের জন্য জলনির্গম আভীক্ষ্য কাজ করা যেতে পারে।

9.7.1 জলনির্গম আভিক্ষ্য নির্ণয় পদ্ধতি প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিস্তৃত আলোচনার জন্য টানা গ্রীডগুলি সাধারণত 1 sq. km. বা 1 sq. km. করা হয় এবং প্রাপ্ত নদীর সংখ্যার সাহায্যে প্রতি মাইল বা প্রতি কিমি-তে জলনির্গম আভীক্ষ্য কত তা দেখা হয় ও একটি সারণী প্রস্তুত করে তাতে লিখে নেওয়া হয়। এবার গ্রীড মানগুলি একটি পৃথক কাগজে গ্রীড টেনে বসিয়ে সমমান রেখা (Isopleth) এঁকে বিভিন্ন শ্রেণী নির্ধারণ করা যেতে পারে। তারপরে ছায়াপাত পদ্ধতি (Shading Method)-এর সাহায্যে শ্রেণীগুলি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। (চিত্র ঃ 17a, b) এখানে উদাহরণ হিসেবে $73\frac{E}{9}$ স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের একটি অংশের নদী আভীক্ষ্য দেখানো হয়েছে।

	A	B	C	D	E	F
1	6	8	7	5	6	5
2	7	6	10	5	7	6
3	10	6	8	7	6	
4	7	6	5	5	7	5
5	10	7	7	8	4	3
6		3		8	8	3

চিত্র 17a :

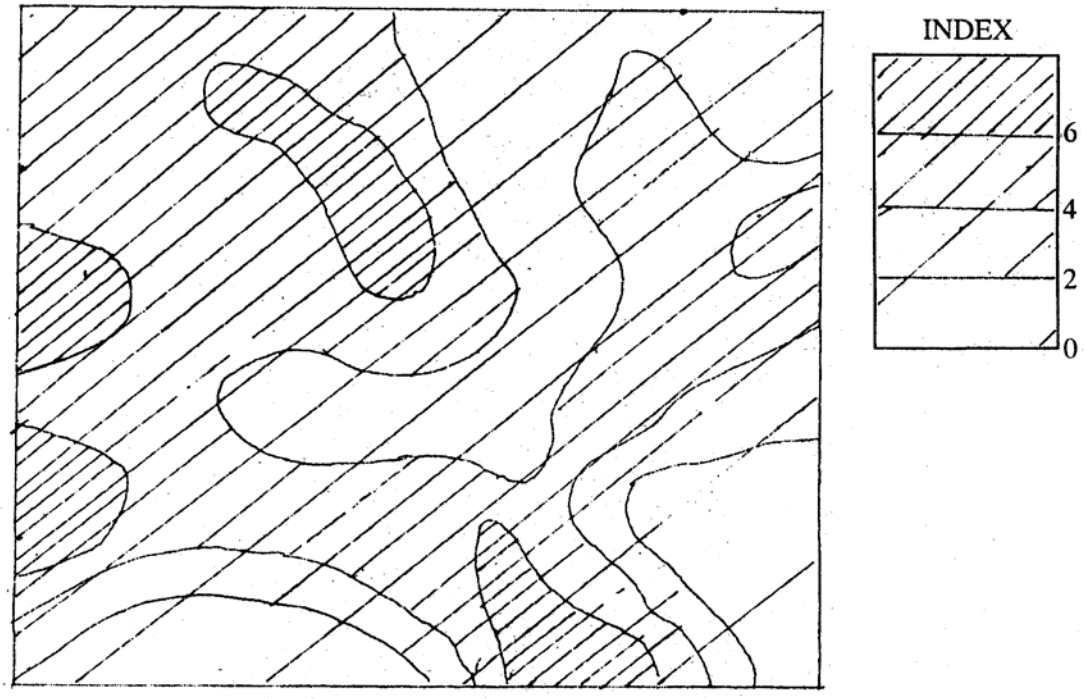

চিত্র 17b :

জলনির্গম আভীক্ষ্য-এর সাহায্যে কোন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাতের কার্যকারীতা, ভূমিরূপ, শিলার প্রকৃতি ও প্রবেশ্যতা, স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘনত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় কিন্তু এই বিশ্লেষণে শুধুমাত্র নদীর সংখ্যা ব্যবহার করা হয় বলে এটি অপেক্ষা অনেক কার্যকরী বিশ্লেষণ হল জলনির্গণের ঘনত্ব (Drainage Density) যেখানে নদীর দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়।

9.8 জলনির্গমের ঘনত্ব (Drainage Density)

জলনির্গমের ঘনত্ব বা নদী ঘনত্ব বলতে বোঝায় প্রতি একক ভূমিতে জলপ্রবাহের দৈর্ঘ্য। এই আখ্যাটি প্রথম ব্যবহার করেন হর্টন (1932) এবং সূত্রটি হল ঃ

$$Dd = \frac{L}{A}$$

যেখানে Dd হচ্ছে একটি অববাহিকার জলনির্গমের ঘনত্ব প্রতি একক ভূমিতে

L হচ্ছে সেই অববাহিকার সমস্ত ক্রমের (order) নদীর দৈর্ঘ্য

A হচ্ছে সেই অববাহিকার মোট আয়তন।

জলপ্রবাহের ঘনত্ব একটি অঞ্চলের প্রবাহরেখাগুলির পারস্পরিক নৈকট্যকে বোঝায় অতএব ভূমিপ্রবাহ (Surface Flow) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

9.8.1 নদী ঘনত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ

জলপ্রবাহের ঘনত্ব যেমন একটি অঞ্চলের অর্থাৎ, একটি সম্পূর্ণ অববাহিকার জন্য গণনা করা যায় তেমনি বিশদ আলোচনার জন্য একটি অববাহিকার কতগুলি বর্গাকার গ্রীডে ভাগ করে প্রতিটি গ্রীডের জন্য জলপ্রবাহের ঘনত্ব হিসেব করে একটি সারণী প্রস্তুত করে তাতে মানগুলি লিপিবদ্ধ করতে হয়। সাধারণত গ্রীডগুলি 1 sq. km. বা 1 sq. মাইল আকৃতির নেওয়া হয়। তারপর একটি গ্রীডের অন্তর্গত নদীগুলির মোট দৈর্ঘ্য যে কোন দৈর্ঘ্য মাপক স্কেলের সাহায্যে মেপে নিতে হয়। এক্ষেত্রে রোটামিটার (Rotameter) নামক যন্ত্রের ব্যবহার করার হয়। তারপর সেই দৈর্ঘ্য মানচিত্রের অনুভূমিক স্কেল অনুযায়ী পরিবর্তিত করে সারণীতে লিখে নেওয়া হয় এবং প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যকে গ্রীডের আয়তন দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় একক প্রতি ভূমিতে নদী ঘনত্ব, এইবার একটি কাগজে অনুরূপ গ্রীড অঙ্কন করে তার মধ্যে (centre) প্রত্যেকটি গ্রীড়ের জন্য প্রাপ্ত নদী ঘনত্বটি বসালে হয়। এবার সমান রেখা (Isopleth) অঙ্কন করে বিভিন্ন ঘনত্ব অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন ঘনত্ব অঞ্চলের জন্য ছায়াপাত পদ্ধতিতে রঙ বা রেখার ব্যবহার করা হয়। এখানে ভারতীয় জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত $73\frac{E}{9}$ স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের একটি অংশের জলপ্রবাহের ছায়াপাত পদ্ধতিতে ঘনত্ব দেখানো হয়েছে। প্রথমে সারণীতে গ্রীড অনুযায়ী মানগুলি লিখে পরে চিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে (চিত্র ঃ 18a, b)।

9.8.2 জলপ্রবাহের ঘনত্বের প্রয়োজনীয়তা ঃ

জলপ্রবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় জলপ্রবাহের ঘনত্ব এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে কোন অঞ্চলের জলপ্রবাহের খাত (channel) সেই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, শিলার প্রবেশ্যতা ও ভূমি প্রবাহের সমষ্টিগত ফল। যদি বৃষ্টিপাতের একটি বড় অংশ শিলায় অনুপ্রবেশ (infiltrate) করে তাহলে অবশ্যই ভূমিপ্রবাহ কম হবে এবং

	A	B	C	D	E	F	
1	2·35	3·40	4·05	2·60	4·00	2·20	1
2	1·90	2·80	3·40	2·30	3·25	3·10	2
3	3·50	3·75	2·90	3·10	3·40	3·00	3
4	2·60	3·90	4·00	2·75	3·85	2·10	4
5	2·85	2·95	3·65	2·70	3·10	2·00	5
6	1·80	1·90	1·65	3·55	3·35	1·75	6
	A	B	C	D	E	F	

INDEX

জলপ্রবাহের মান

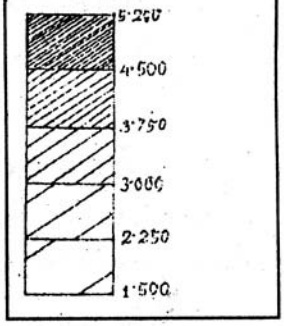

চিত্র 18a :

বিহার/পশ্চিমবঙ্গ

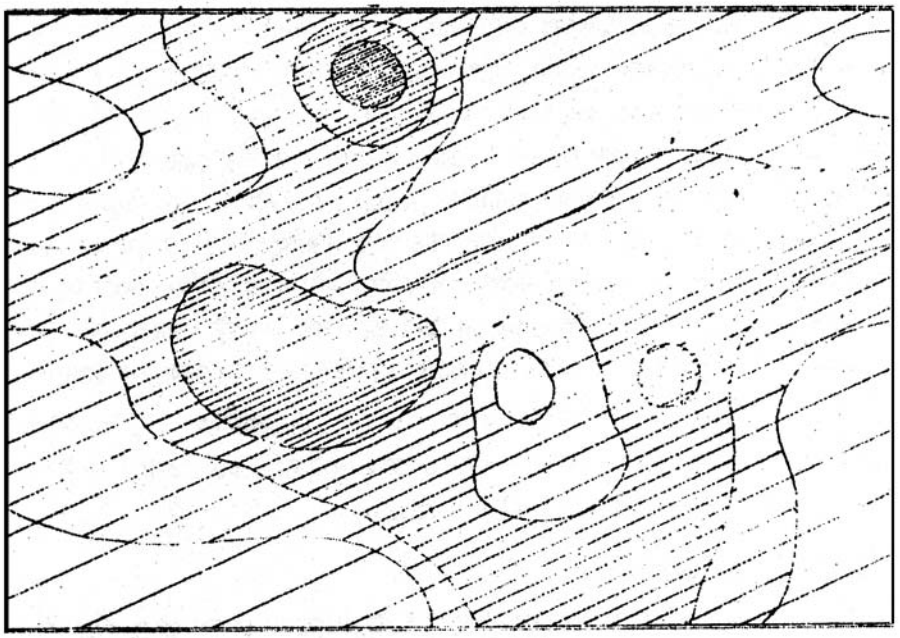

Scale : 1 : 50,000

চিত্র 18b :

জলপ্রবাহের ঘনত্ব সেই অনুপাতে কম হবে। দেখা গেছে বালুকাপ্রধান শিলা বা মৃত্তিকায় জলপ্রবাহের ঘনত্ব কম এবং কর্দমপ্রধান শিলা বা মৃত্তিকায় জলপ্রবাহের ঘনত্ব বেশী। সুতরাং জলপ্রবাহের ঘনত্ব অবশ্যই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রবেশ্যতা ও ভূমিপ্রবাহের সূচক।

মেলটন (Melton, 1957) দেখিয়েছেন যে, জলপ্রবাহের ঘনত্বের সাথে বৃষ্টিপাতের কার্যকারীতা (Precipitation effection) অর্থাৎ বাষ্পীভবনের ও বৃষ্টিপাতের পারস্পরিক হার ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘনত্ব প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ রয়েছে। কটন (Cotton, 1964) দেখিয়েছেন বৃষ্টিপাত ও তার উপর ভূমিরূপ, মৃত্তিকা শিলার প্রকৃতি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবের একটি অন্যতম সূচক জলপ্রবাহের ঘনত্ব। অতএব অববাহিকা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় জলপ্রবাহের ঘনত্বের সাহায্যে।

9.9 প্রশ্নমালা

1. প্রদত্ত স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র থেকে কতগুলি পরিলেখ অঙ্কন করুন।

2. প্রদত্ত স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের একটি নির্বাচিত অংশের সারিবদ্ধ পরিলেখ, অধ্যারোপিত পরিলেখ, বিমিশ্র পরিলেখ ও অভিক্ষিপ্ত পরিলেখ অঙ্কন কর ও ব্যাখ্যা করুন।

3. যে কোন একটি মালভূমি অঞ্চলের স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র নিন ও একটি অংশ (5' × 5') নিয়ে তার আপেক্ষিক ভূমিরূপ ও ব্যবচ্ছেদনের সূচক নির্ণয় করুন। ভূমিরূপটি বিশ্লেষণে এদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

4. যে কোন একটি স্থানীয় বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র নিয়ে একটি নদী অববাহিকা চিহ্নিত করুন ও হর্টনের পদ্ধতিতে নদীর ক্রমবিকাশ করে দ্বিধাবিভক্তির হার নির্ণয় করুন।

5. নদীর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন। আপনার মতে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

6. নদী ঘনত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে একটি অঞ্চল (36 sq. km.) নির্দিষ্ট করে নদী ঘনত্ব নির্ণয় করুন।

9.10 গ্রন্থপঞ্জী

1. Dury, G. H. 1966 Essays in Geomorphology Heinmann, London.
2. Dury, G. H. 1972 Map Interpretation, Pitman Publishing.
3. King, C. A. M. 1967 Techniques in Geomorphology, Enward Arnold, London.
4. Monkhouse, J. F. and Wilkinson, R. H. (1989) Maps and Diagrams, B. I. Publications Pvt. Ltd.
5. Sarkar, A. (1997) Practical Geography, A Systematic Approach, Orient Longman.
6. Singh, S. (1998) Geomorphology, Prayag Pustak Bhawan.
7. Singh, V. P. (1992) Elementary Hydrology Prentice Hall of India Pvt. Ltd.

NOTE